শুকতারা

একাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৬৪

দেব সাহিত্য কুটীর

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হারিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"শুকতারা" পড়ছো যে-সব ভাইবোনেরা—

কাগজ

যে কত দামী, তা' তোমরা জানো। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভোজ এই কাগজের পাতায় ক'রে পরিবেশন করেছেন বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা তোমাদের কাছে। এই কাগজের সম্মান তোমরাই রাখবে—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা, অর্থাৎ লেখাপড়ায়।

●

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, লেখন-সামগ্রী

ইত্যাদি বিক্রেতা

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"—৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-১

●

—শাখা—

কলিকাতার সর্ব্বত্র, উত্তরপ্রদেশ ও আসাম

ফোন—২২-৪৯৯১ | পোঃ বক্স—৭৬২ | তার—"নোটপেপার"

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).
(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950).

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৬৪

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	দানব দলন (চিত্র-পরিচয়)	বিমলচন্দ্র ঘোষ	মুখপত্র
২।	খোকার আবিষ্কার (কবিতা)	শ্রীননীলাল দে	১
৩।	বোকার ধাড়ি (হাসির গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩
৪।	অগ্নিদৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি (পৌরাণিক গল্প)	শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	৯
৫।	রাজভোগ (গল্প)	রবিদাস সাহা রায়	১৬
৬।	খাবি কি ? (কবিতা)	শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত	২১
৭।	নিতাই (গল্প)	শ্রীরামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২২
৮।	সে কী কাণ্ড ! (রূপক গল্প)	শ্রীঅলককুমার ঘোষ	২৭
৯।	পাতালগুহার কথা (প্রবন্ধ)	নীরদচন্দ্র মজুমদার	৩৬
১০।	আনন্দ-উছল সুইটজারল্যাণ্ড (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	৩৯
১১।	বাহাদুর শাহ্ (গল্প)	ডাঃ শ্রীধর সেনাপতি	৪৫
১২।	অজানার উজানে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৫১
১৩।	"নয়নে বসন বাঁধিয়া—" (গল্প)	শ্রীমলয়কান্তি বসু	৫৭
১৪।	ড্রুম্যাণ্ড স্ট্রীটের হোটেল (করুণ-কাহিনী)	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৬০
১৫।	আশীর্বাদ (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত)	বীথি বিশ্বাস	৬৫
১৬।	একটি গল্পের ভূমিকা (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)	শ্রীদেবেশ পাল	৬৮
১৭।	মুক্তকেশী সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)		৭১
১৮।	সোনার বাংলা (চিত্রে ইতিহাস)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৭২
১৯।	খেলার আসর (খেলাধূলা)	শ্রীসাংবাদিক	৭৫
২০।	উজল পাতা (আলোক-চিত্র)	...	৭৬
২১।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	...	৭৭
২২।	দাদুমণির চিঠি		৭৮

পাদপূরণ

স্প্রিং চালিত বাই-সিকেল (সচিত্র)	২
চালকবিহীন লাঙ্গল (সচিত্র)	৮
জেনে রাখা ভালো (সচিত্র)	৩৫

পাদপূরণ

গল্প হলেও সত্যি	৪৪
রোগ মুক্ত করো (সচিত্র)	৬৪

[জরুরী ঘোষণা……মুখপত্র (খ)]

'শুকতারা'র নিয়মাবলী

১। "শুকতারা"র চাঁদার হার (সডাক): বার্ষিক—৪৲, ষাণ্মাসিক—২॥০ ও প্রতি সংখ্যা ।৵০। নমুনা-সংখ্যার জন্য ।৵০ আনার ডাক-টিকেট বা মণি-অর্ডার যোগে ।৵০ আনা পাঠাইতে হয়।

২। ফাল্গুন মাস হইতে "শুকতারা"র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া, ফাল্গুন অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

৩। প্রতি মাসে ১লা তারিখের মধ্যেই পত্রিকা Ordinary Post-এ পাঠান হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোস্টমাস্টার মহাশয়ের দ্বারা পত্রিকা না পাইবার বিষয়ে সুপারিশ করাইয়া চিঠি লিখিলে, Certificate of Postingএ পুনরায় পাঠান হয়।

৪। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে, ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের গল্প, কবিতা, ফটো অথবা তাঁহাদের আঁকা ছবিও "শুকতারা"য় প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান কিংবা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বিভাগের লেখা আলাদাভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ও নকল রাখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৬। ধাঁধার উত্তর ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের অফিসে পৌঁছান দরকার।

"শুকতারা-বিভাগ"
২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

সম্পাদক,
"শুকতারা"

জরুরী ঘোষণা

"শুকতারা"র গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণ!

ফাল্গুন মাসে "শুকতারা" একাদশ বর্ষে পদার্পণ করলো। যাঁরা এ বছরেও গ্রাহক বা গ্রাহিকা হয়ে নিয়মিত ভাবে "শুকতারা" পেতে চান তাঁরা ফাল্গুন মাসের মধ্যেই মণি-অর্ডার করে চার টাকা পাঠান।

তা' না হ'লে গ্রাহক-গ্রাহিকার তালিকাভুক্ত হ'তে অসুবিধা হ'তে পারে।

কর্মাধ্যক্ষ, "শুকতারা"

এস্. সি. মজুমদার কর্তৃক দেব-প্রেস, ২৪ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত।

দানব দলন

দানব দলন

— বিমলচন্দ্র ঘোষ

পাহাড়ের মতো চেহারা
অসুরের মতো শক্তি !
হিংস্র মেজাজ বেয়াড়া
করে না মানুষ ভক্তি ॥

ঘন ঘন ছাড়ে হুঙ্কার
গদা হাতে করে যুদ্ধ।
নেই কোনো সৎগুণ যা'র
হিংসায় লোভে ক্রুদ্ধ ॥

লাফায় দানব দুষ্ট
সুখ শান্তির রাজ্যে।
রক্তপানেই তুষ্ট
কোমরে ঘণ্টা বাজছে ॥

ইতিহাসে এরা এনেছে
অমঙ্গলের দৃষ্টি।
কত না আঘাত হেনেছে
সভয়ে কেঁপেছে সৃষ্টি ॥

সভ্যতা ভেঙে চুরে
যুগে যুগে করে ছারখার।
লুট করে ঘুরে ঘুরে
কত না সোনার সংসার ॥

এরাই কুম্ভকর্ণ
কপালে রক্তটিকা।
মানে না মানবধর্ম
আনে শুধু বিভীষিকা ॥

ছ'মাস কেবল ঘুমায়
একদিন শুধু জাগে
গোগ্রাসে সব গিলে খায়
দেখলে ভিরমি লাগে ॥

রাম লক্ষ্মণ বার বার
ভেঙেছে দম্ভ দানবের
উড়েছে শান্তি-সাধনার
পতাকা শান্ত মানবের ॥

———

একাদশ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • ১৩৬৪, ফাল্গুন

খোকার আবিষ্কার

—শ্রীননীলাল দে

অনেক কিছু বাক্-বিতণ্ডা—তর্ক করার পরে,
রেডিওটা কিনে বাবা নিয়ে এলেন ঘরে!
কত দূরের মজার কথা হাওয়ায় ভেসে আসে,
কি আনন্দে তাই যে শুনি বসে তাহার পাশে।
গল্পদাদুর আসর থেকে কত গল্প শুনি,
শুনে শুনে অবাক্ হ'য়ে স্বপ্নেরই জাল বুনি।
নানা দেশের নূতন খবর কত রকম গান,
মিষ্টিমধুর বাজনাতেও উতল করে প্রাণ।
বাক্সে যেন লুকিয়ে আছে নানা দেশের স্বর,
মিষ্টি মধুর নানান সুরে ভরিয়ে দেয় ঘর।
কাণ্ড দেখে খোকনমণি অবাক্ হ'য়ে থাকে,
'কে কথা কয়' শুধায় মোরে, গানের ফাঁকে ফাঁকে।

ক্ষণে ক্ষণে হাত দিয়ে সে, ইসারা দেয় চুপে,
আওয়াজ শুনে' চম্‌কে ওঠে ; থামাই কোনরূপে।

সেদিন মোরা দুপুর বেলা ঘুমিয়ে আছি সবে,
তড়াক্ করে উঠ্‌ছি জেগে খোকার কলরবে।
চেয়ে দেখি শূন্য টেবিল, রেডিও নেই আর,
মাটিতে হায়! গড়িয়ে পড়ে' ছড়িয়ে আছে তার।
খোকনবাবু তবুও তাতে মারছে ঘুষি কিল,
কাউকে যেন দিচ্ছে তাড়া, থামছে না এক তিল।
ব্যস্ত হ'য়ে টেনে নিলুম শুধাই ওরে বল্,
রেডিওটা ফেল্লি কেন, ভেঙে দিলি কল ?
খোকন বলে ;—আমার সাথে গল্প করে না যে,
ওর ভেতরে কেউ ত' নেই, সবই দেখছি বাজে !

স্প্রিং চালিত বাই-সিকেল

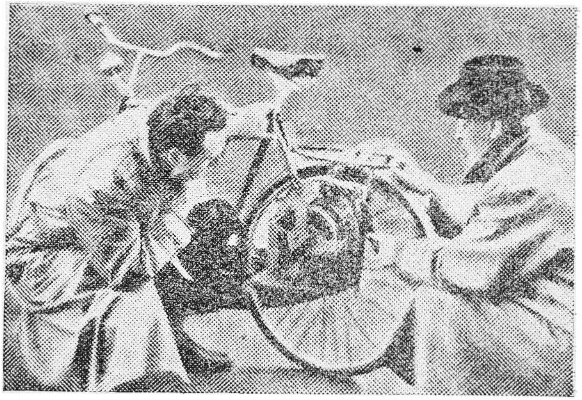

নেদারল্যাণ্ডে একটি স্প্রিং-এর ইঞ্জিন বেরিয়েছে। একটি বাই-সিকেলের পেছনের চাকার সঙ্গে এই স্প্রিং সংযুক্ত করে দিলে, চালক এক মাইল পথ প্যাডল ঘুরিয়ে যাবার পর, চার মাইল উক্ত স্প্রিং-এর শক্তিতে অতিক্রম করতে পারে। প্রথম এক মাইল প্যাডল করার ফলে স্প্রিং গুটিয়ে যায়। স্প্রিং চালিত বাই-সিকেল ঘণ্টায় প্রায় ১৫ মাইল বেগে চলে। এই বাই-সিকেল চালাবার জন্যে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয় না।

এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা সর্বদাই চিন্তা করে কি ক'রে জনসাধারণের পরিশ্রম লাঘব করা যায়। ফলে নানা যন্ত্রের উদ্ভব হয়। আবিষ্কারক আর তার দেশ লাভবান হয়। চিন্তা করলে আমাদের দেশের ছেলেরাও নানা যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারে।

বোকার ধাড়ি

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

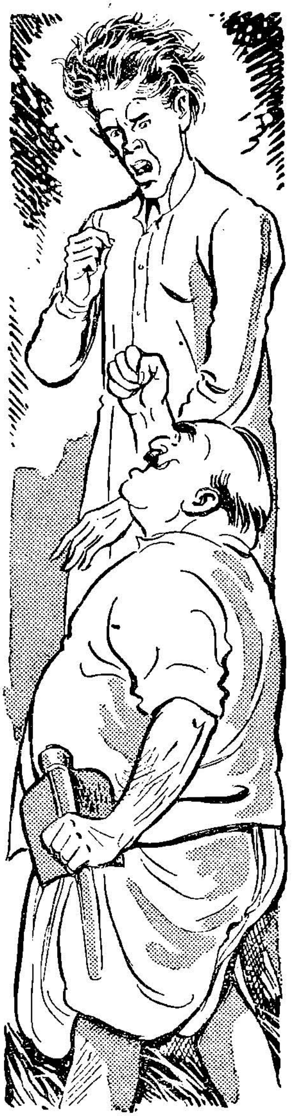

দুই বন্ধু। পথ চলেছে একসাথে।

ওদিক থেকে এক বুড়ী আসছিল, ওদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললে—"পেন্নাম হই বাবা!"

তার পর বুড়ী চ'লে গেল।

বুড়ী চ'লে গেল বটে, কিন্তু বাধিয়ে রেখে গেল মস্ত ফ্যাসাদ। দুই বন্ধু ঝগড়া সুরু করল। এ বলে—'পেন্নাম আমায় করেছে'; ও বলে—'পেন্নাম আমায় করেছে।'

ঝগড়া আর মেটে না।

তখন তারা ছুটল বুড়ীর পিছনে—পেন্নামটা সত্যি সত্যি কাকে সে করেছে—জেনে নিতে হবে।

বুড়ী আপন মনে চলেছে। ওরা পিছন থেকে ডাকাডাকি করছে—"বুড়ী-মা, দাঁড়িয়ে যাও, একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও।"

বুড়ী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। "কী গো বাবারা? কী হয়েছে?"

দু'জনে এক সাথে কথা কইতে লাগল—"একটা কথা ব'লে দিয়ে যাও। তুমি যে তখন পেন্নাম জানালে—ওটা কাকে? আমাকে, না, একে?"

বুড়ী হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ওদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল—একবার এর, একবার ওর। তারপর—

তারপর সে হেসে ফেলল।

বন্ধুরা বলল—"হাসছ যে? বল না, কাকে পেন্নাম করেছ?"

বুড়ী কথা কইল এবার। "পেন্নাম করেছি তাকে—দু'জনের মধ্যে যে বেশী বোকা।"

প্রথম বন্ধু লাফিয়ে উঠল—"বেশী বোকা?—সে তবে আমি। আমার বাড়ির লোক, আমার গাঁয়ের লোক সবাই একবাক্যে চিরদিন ব'লে আসছে—আমার মত বোকা দুনিয়ায় আর নেই।"

"দুনিয়ায় আর নেই?"—নাক সিঁটকে টিট্‌কারি দিয়ে উঠল দ্বিতীয় বন্ধু—"দুনিয়ায় আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ ও-কথা বলা আর কারও সাজে না। আমি হচ্ছি বোকার ধাড়ি—বোকার বাদ্‌শা—যাকে বলে রাম-বোকা! নিজের বাড়ির বা নিজের গাঁয়ের লোক নয়, আমার বোকামির তারিফ করেছে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। তাদের সার্টিপিটির (সার্টিফিকেটের) দাম বেশী নয়?"

বুড়ী এক একবার গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে; পরমুহূর্তেই হাসতে হাসতে ফেটে পড়ছে একেবারে! এইবার সে রাস্তার ধারে চেপে ব'সে বললে—"তাহ'লে বাবুরা, তোমাদের বোকামির গল্প শুনতে হয়! না শুনে কেমন ক'রে বলব—কে বেশী বোকা!"

"বেশ ত', শোনো তা' হ'লে!"—প্রথম বন্ধু বলতে সুরু করল—

"একদিন এক কুটুমবাড়ি যাব ব'লে সেজেগুজে বেরুলাম সক্কাল বেলা। যাব অনেক দূর—বেলা দুপুর হয়ে এল। দারুণ রোদ্দুর—ঘেমে গেলাম একেবারে। মাথার চাঁদি যেন ফেটে যেতে চায়—একটু না জিরিয়ে নিয়ে আর যেন হাঁটতে পারি না।

একটা পোড়ো বাগান দেখতে পেলাম পথের ধারে। তারই ভিতর ঢুকে দেখি গাছতলায় এক পুরোনো ইঁদারা। মাথার পাগড়ি আর পায়ের জুতো খুলে রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম গাছের ছায়াতে। কী চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে সেখানটায়! আরামে চোখ বুজে এল। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

ঘুম যখন ভাঙল, মাথা ঘুরে গেল আমার। পাশে ছিল পাগড়ি আর জুতো, কোথাও তা' নেই। নেই! একদম হাওয়া! ইঁদারায় কেউ জল তুলতে এসেছিল, হাতসাফাই করেছে আর কি!

এখন উপায়? খালি-পায়ে খালি-মাথায় ত' কুটুমবাড়ি যাওয়া চলে না! লোকে ভাববে কী? অনেক ভেবে বাড়ির দিকে ফিরলাম আবার।

রোদে পুড়তে পুড়তে, ক্ষিধে তেষ্টায় জ্বলতে জ্বলতে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি যখন, আমাদের বাড়ির চাকরটা তখন মাঠে গোরু বাঁধছে। আমায় দেখে সে একবার তাকাল আমার মাথার দিকে, আর একবার তাকাল আমার পায়ের দিকে। বেশ চোখা নজরেই তাকাল; তারপর কী জানি কেন ঝড়ের বেগে ছুটল বাড়ির দিকে।

কেন ছুটল বুঝতে না পেরে, আমি পিছন থেকে তাকে ডাকাডাকি করলাম দু'চার বার। সে তাতে কানই দিল না। অগত্যা আমিও চললাম তার পিছনে। আস্তে আস্তেই চললাম; ছুটবার শক্তিও ছিল না, দরকারও বুঝলাম না।

কাজেই বাড়ি পৌঁছুলাম চাকরটার বেশ খানিকটা পরে।

কিছুটা দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম একটা বিকট কান্না। অনেক লোক যেন একসাথে মড়া কান্না সুরু করেছে। ব্যাপার কী? কেউ মরল না কি? মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গেল। কে গেল? উঃ হুঃ হুঃ—কে মরল?

আমিও বাড়ি ঢুকলাম কাঁদতে কাঁদতে; যেই ম'রে থাকুক, আমাদের ত' কাঁদতেই হবে!

আমায় কাঁদতে কাঁদতে ঢুকতে দেখে বাবা, দাদা, মা, দিদি সবাই কান্নার সুর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিলেন। চাকরটা উঠোনে ব'সে মাথা কুটছে কেবল, আর ক্রমাগত হায় হায় করছে!

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম, ব'সে পড়লাম কাঁদতে কাঁদতে। তারপর মাটিতে শুয়ে আছাড়ি বিছাড়ি!

ভিড় জ'মে গেল বাড়িতে। পাড়ার সবাই ছুটে এল। পুরুত ঠাকুর এলেন ও পাড়া থেকে।

'কে গেল? কে গেল?'—জিজ্ঞাসা করে সবাই।

সবাই বাবাকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করছে। তিনি মাথা নেড়ে নেড়ে কেঁদেই চলেছেন। তারপর সবাই পড়েছে দাদাকে নিয়ে। দাদা কাঁদতে কাঁদতে বললে—'চাকরটা—আমার ভাইটা—হায় হায় হায়!'

অনেক কষ্টে সবাই আবিষ্কার করল যে চাকরটা আমায় খালি মাথায় খালি পায় আসতে দেখেই ছুটে বাড়িতে এসে খবর দিয়েছে যে কুটুমবাড়িতে কে যেন মারা গিয়েছে। যেই মরুক, শোকের কথা ত' বটেই! তাই সবাই কাঁদছে!

তখন পুরুত আমায় নিয়ে পড়লেন—'কে মরেছে রে কুটুমবাড়িতে?'

'কুটুমবাড়িতে ত' কেউ মরেনি! আমি সেখানে যাই-ই নি ত'!'—থতমত-খেয়ে জবাব দিলাম আমি।

'তবে তুই কাঁদছিস্ কেন?'

'কাঁদছি এদের কাঁদতে দেখে!'

তখন সবাই সাব্যস্ত করল যে আমিই সবার চাইতে সেরা বোকা। কারণ অন্য সবাই কাঁদছিল আমার অশৌচের মত অবস্থা দেখে। আর আমি একান্ত অকারণেই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি।"

প্রথম বন্ধুর গল্প শেষ হ'ল। বুড়ী সমঝদারের মত মাথা নেড়ে বলল—"তুমি খুবই যে বোকা, তা' মানতেই হয়। তবে তোমার বন্ধুর কথা না শুনে ত'

বলতে পারিনে যে পেন্নামটা তোমারই পাওনা কিনা ! বল বাবু, তোমার গল্প বল। আমার অনেক কাজ আছে।"

দ্বিতীয় বন্ধু তখন আরম্ভ করল—

"সবে তখন বিয়ে করেছি। শ্বশুরবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এল—দুই একদিন সেখানে গিয়ে থাকতে হবে।

যাওয়ার সময় বাড়ির সবাই পই-পই ক'রে সাবধান ক'রে দিল—'ওখানে গিয়ে বেশী খাসনি যেন। তুই এমনিতেই বেশ একটু পেটুক ; সেখানে ভাল-ভাল খাবার পেয়ে গোগ্রাসে যদি কেবলই গিলতে থাকিস্, দারুণ বদ্‌নাম হয়ে যাবে। সবাই বলবে—হাঘরের ছেলে। খবর্দার ! খবর্দার !'

আমি স্বীকার করলাম—কিচ্ছুটি খাব না।

গেলাম শ্বশুরবাড়ি। যাওয়ামাত্র তিনটে রেকাবি এসে হাজির। পিরামিডের মত সাজানো রাজভোগ কমলাভোগ সরপুরিয়া সন্দেশ। জিভে জল এল যেন হিমালয়ের গা বেয়ে পাগলাঝোরা নামছে। হাত বাড়াতে যাব—এমন সময় বাড়ির কথা মনে প'ড়ে গেল। 'খবর্দার ! খবর্দার ! সবাই বলবে হাঘরের ছেলে !'

কিচ্ছুটি খেলাম না। বললাম—'মিষ্টি আমার ভাল লাগে না !'

রাত হ'তে না হ'তেই খাবারের জায়গা। আধ-হাত-পুরু আসনের সামনে এত্তোবড়ো রুপোর থালার পাশে প্রায় দুই কুড়ি ছোট বড় সোনারুপোর বাটি। পোলাও মাংস মাছ মুড়িঘণ্ট ক্ষীর পায়েস রাবড়ি থরে থরে সাজানো আমার চোখের উপর। প্রাণটা ছুটে এল জিভের ডগায়, কিন্তু আমার খাবার উপায় নেই। বাড়ির নিষেধ—খবর্দার ! খবর্দার—

এক গ্রাস পোলাও, এক চামচ রাবড়ি, এক রত্তি মাংস—ব্যস্ ! আমার খাওয়া শেষ। শাশুড়ী কেঁদে ফেলবার মত—'কিছুই যে খেলে না বাবা !'—

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—'একে আমি খাই বড় কম, তায় আজ আবার মোটেই ক্ষিধে নেই।'

ক্ষিধে আছে কি নেই, তা' জানি শুধু আমি, আর জানেন আমার ভগবান। রাত্রে শুয়ে শয্যাকণ্টকি। চোখ বুজব সাধ্য কি ! বত্রিশ নাড়ী পাক দিচ্ছে পেটে। কাপড়ের কষি এঁটে বাঁধছি, পাশ বালিশ চেপে ধরেছি পেটের উপর। কিছুতেই কিছু হবার নয়, উদরে যেন দেবাসুরের লড়াই চলছে !

উঠতে হ'ল। কিছু একটু না খেলে নয়। জ্বলে যাচ্ছে, হিক্কা উঠছে, চোখের সামনে সর্ষে ফুল ফুটছে ! এক্ষুণি ম'রে যাব কিছু না খেলে ! কাউকে ডেকে খাবার চাওয়া চলবে না ; সবাই টিটকারি দেবে হাঘরে বলে। কিন্তু তবু খেতে হবেই।

চুপি চুপি অন্ধকারে রান্নাঘরের দিকে।...

সন্ধ্যাবেলায় যেখানে খাওয়া-দাওয়ার অমন সমারোহ ছিল, সেখানে হেঁসেলে কি আর কিছুই প'ড়ে নেই ?—অবিশ্যি আছে।

কিন্তু পোড়া কপাল আমার—হেঁসেলে কিচ্ছুই মিলল না। হয়তো বাড়তি খাবারগুলো তারা অন্য ঘরে সরিয়ে রেখেছে।

—এখন আমার উপায় ?—

প্রাণ যে যায় !

একটা হাঁড়ির ভিতর কী এ ঢাকা দেওয়া রয়েছে ?

ধুত্তোর। কাঁচা ডিম কতকগুলো।

কিন্তু তক্ষুণি মনে প'ড়ে গেল—কাঁচা ডিম সাহেবেরা খায়। খুব উপকারী ! খুব বলকারক !

বাড়িতে কোথায় যেন কারা কথা কইছে। রান্নাঘরে আমার চলাফেরার শব্দে জেগেছে বোধ হয় ওরা। তাড়াতাড়ি স'রে পড়তে হয় এবার। দুটো কাঁচা ডিম হাতে নিয়ে দে লম্বা !

তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই হোঁচট খেলাম অন্ধকারে। আর সেই শব্দে আমার ঘরের দিকেই ছুটে এল সবাই। 'জামাইয়ের ঘরে চোর ! পাকড়ো ! মারো !'

আমি কোনমতে ঘরে ঢুকে বিছানায় সটাং ! দোর বন্ধ করার আর সময় হ'ল না।

ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। 'জামাইবাবু ! জামাইবাবু'—ডাকছে বড় শালা।

বামাল তখনো আমার হাতে। পাছে ওরা দেখে ফেলে—দুটো ডিমই মুখে পুরে দিলাম।

'জামাইবাবু ! জামাইবাবু !'—আমার সাড়া দেবার উপায় নেই, মুখে ডবল ডিম !

লণ্ঠন তুলে আমার মুখের উপর আলো ফেলল।

আর অমনি আঁতকে উঠল বড় শালা। 'জামাইবাবুর কী হয়েছে—দেখো মা ! মুখটা এমন বিশ্রী ফুলে গেছে—'

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার উপর। আমি জেগে রয়েছি, চোখ চেয়েও দেখছি—কিন্তু কথা কইতে পারছি না।

শাশুড়ী কেঁদে উঠলেন—'বাছা কথা কইবে কেমন করে ? দেখছিস না—কত বড় দুটো ফোড়া উঠেছে দুই গালে ! হে ভগবান, এ কী করলে ঠাকুর ? এই যে দুঘণ্টা আগেও দিব্যি ভাল মানুষ ছিল—'

বুড়ো শ্বশুর আবার ডাক্তার। তিনি বললেন—'এ-ফোড়া এখুনি না কেটে দিলে বিষিয়ে উঠবে, ম'রে যাবে জামাই।'—অস্ত্র এনে এ গালে এক পোঁচ, ও গালে এক পোঁচ—

ডিমের সাদা-হলুদ দু'টো অংশই কাটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—ডাক্তার বললেন—'দেখছ কী রকম থক্‌থকে পুঁজ!'

কিন্তু ডিমের খোলা দু'টো যখন বেরুলো—তখন—"

গল্প শেষ হওয়ার আগেই বুড়ী হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ ক'রে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

"বাবা, তুমি সত্যিই রাম-বোকা, বোকার বাদশা, বোকার ধাড়ি। আমার পেন্নাম তোমারই পাওনা ছিল। শুধু একটা কেন, আরও একশোটা পেন্নাম করব তোমায়। দাঁড়াও তুমি।"

● চালকবিহীন লাঙ্গল

বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশে যান্ত্রিক লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ হয়। সম্প্রতি চালকবিহীন লাঙ্গল ক্ষেত চষার কাজ করছে। ছবিতে দেখ, একজন চাষী লাঙ্গলটি চালিয়ে দিয়ে ক্ষেতের ধারে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছে। হাতে রেডিয়ো যন্ত্র। সেই যন্ত্রের দ্বারা যান্ত্রিক লাঙ্গলকে সে চালিত করছে।

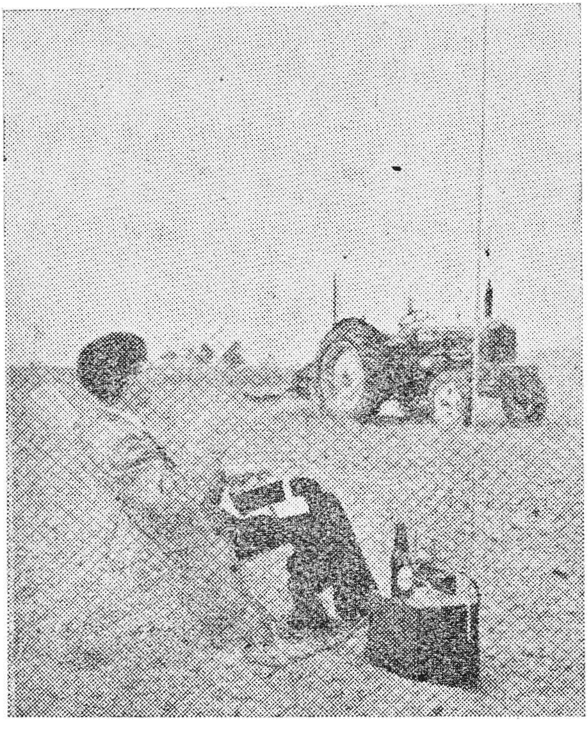

অগ্নিদৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

অনেক কাল আগের কথা। হাজার, দু'হাজার, তিন হাজার, এমন কি চার হাজার বছর আগের কথাও হতে পারে। সেই সময় বারানসীর কাছে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

অত্যন্ত গরীব বামুন। দু'বেলা খাওয়া কোনো দিনই জুটত না। এমন কি মাঝে মাঝে একবেলাও জুটত না। জুটবে কি করে? সম্বল তো ভিক্ষে। কিন্তু দুর্বল শরীরের জন্যে সব দিন তো ভিক্ষেয় বার হতে পারতেন না!

সংসারে ছিল তাঁর স্ত্রী আর একটা ছেলে কৌশিক।

কৌশিকের বয়স বছর এগারো-বারো হবে। কিন্তু বয়স অল্প হলে কি হবে? বাপ-মায়ের অবস্থা দেখে ওইটুকু বয়সে সে ভাবতে শিখলে। বাপ-মায়ের বুড়ো-বয়সের একমাত্র সন্তান। বোধ হয় অনেকগুলিকে হারিয়ে ওইটিকে পেয়েছেন। সেজন্যে বাপ-মা তাকে কোনো কাজ করতে দিতেন না।

সুতরাং সে ভাবে।

ভাবা ছাড়া কীই বা তার করবার আছে?

সে ভাবে। যেদিন বাবা মা দুজনেই বেরিয়ে যান,—একজন ভিক্ষেয় আর একজন মাটিতে-পড়া গাছের শুকনো ডাল কুড়োতে,—ও তখন কুঁড়ে ঘরের সামনে গাছতলায় একা বসে বসে ভাবে। যেদিন তাঁরা বার হতে পারেন না, ঘরে উনান জ্বলে না, রান্না চড়ে না, সেদিনও বাপ-মায়ের চোখের আড়ালে একা একা ভাবে।

প্রথম প্রথম এলোমেলো ভাবত। নিতান্ত ছেলেমানুষি ভাবনা। আকাশ-কুসুম কত কি কল্পনা। কিন্তু ভাবতে ভাবতে অবশেষে তার চিন্তায় একটা শৃঙ্খলা এল। সে ভাবতে লাগল, বুড়ো বাপ-মায়ের কথা, অন্নকষ্টের কথা, নিজের ভবিষ্যতের কথা।

বুড়ো বাপ-মায়ের কত দুঃখ। শরীর জীর্ণ। তাই নিয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া। কোনোদিন ভিক্ষা জোটে, কোনোদিন জোটে না। সেও তাদের কোনো সাহায্যেই আসছে না। না পাচ্ছে নিজে খেতে, না পারছে বাপ-মাকে খাওয়াতে।

কৌশিক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে···

কৌশিক ভাবে।

ভেবে ভেবে স্থির করলে, সে তপস্যা করতে যাবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, তপস্যা তো তার কাজই! তপস্যায় শক্তি বাড়বে, প্রতিষ্ঠাও বাড়বে। সুতরাং পড়ে পড়ে উপোস করার চেয়ে সেই ভালো।

এবং একদিন চুপি চুপি বাড়ি থেকে সরে পড়ল।

অনেক দূরে চলে গেল। সেখান থেকে তার দুর্বল জরাজীর্ণ বাপ-মা'র পক্ষে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব।

সেইখানে বহু বছর ধরে এক নাগাড়ে সে তপস্যা করলে একটা নির্জন বনের মধ্যে, পাহাড়ের গুহায়।

সকালে ভিক্ষেয় বেরোয়। একবেলা তাই খায়। আর দিন-রাত্রির বাকি অংশ তপস্যা করে।

কঠোর তপস্যা।

এই অবস্থায় একদিন দুপুরবেলায় একটা গাছের নীচে ছায়ায় বসে সে বিশ্রাম করছিল। এমন সময় একটা বক গাছের ডাল থেকে তার মাথায় পুরীষ ত্যাগ করলে।

কৌশিক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই বকটা মরে পড়ে গেল।

কৌশিক অবাক!

তাহলে এতো বৎসরের তপস্যায় যথেষ্ট শক্তি সে তো পেয়েছে! নইলে তার দৃষ্টিতে বকটা মরে যাবে কেন?

মনে মনে নিজের সাফল্যে সে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করলে। এখন আর সে সামান্য ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুক নয়। সে তপস্বী। তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণী প্রাণ হারায়!

ভাগ্যিস, বাপ-মায়ের আঁচল ধরে সেইখানে তাঁদের কাছে সে পড়ে থাকেনি। তাহলে

এ শক্তি সে পেত কোথায়? শক্তি পাওয়া দূরে থাক, না খেতে পেয়ে মরেই যেত কোন দিন।

ভাবতেও কৌশিকের বুক আনন্দে ভরে উঠল।

কিন্তু সেই সঙ্গে মরা বকটার দিকে চেয়ে তার মনে দুঃখও হল। আহা, বেচারা বক! সে তো সত্যি-সত্যি তাকে অপমান করবার জন্যে ওই নোংরা কাজটা করেনি। ওটা তাদের স্বভাব। স্বভাববশেই করেছে।

তা ছাড়া তপস্যার দ্বারা কৌশিকের যে অতখানি শক্তি হয়েছে, তাই বা ওই বনের পাখি কি জানবে? সে নিজেই তো জানত না। জানলে কি আর পাখিটার দিকে অমনি করে চাইত, না তাকে মেরে ফেলত?

বেচারা পাখি!

এর পরে কৌশিক একদিন ভিক্ষেয় বেরুল পাশের গ্রামে। একটি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকলে: আমাকে ভিক্ষে দিন মা!

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি বৌ। নাম তাঁর সুব্রতা। তাঁর পরনে চওড়া লাল-পাড় গরদের শাড়ী। মাজা সোনার মতো ঝক্‌ঝকে রং। দেখলে চোখ ঝলসে যায়। শান্ত দুটি চোখ। সদ্য স্নান করে উঠেছেন। এলোচুল পিঠের উপর গেরো দিয়ে বাঁধা।

বোধ হয় পূজোয় বসতে যাচ্ছিলেন। অতিথির ডাক শুনে বাইরে এসেছেন।

স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন ঠাকুর। আমি এখনই ভিক্ষে নিয়ে আসছি।

বলেই ভিক্ষে আনতে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর স্বামী বাইরে থেকে ফিরলেন। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। রোদে মুখ লাল। সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ছুটছে। দেখলেই বোঝা যায় খুব পরিশ্রান্ত।

ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ বাইরে অপেক্ষা করছেন জেনেও সুব্রতা তৎক্ষণাৎ স্বামীর শুশ্রূষায় লাগলেন। তাঁর পা ধোবার জল এনে দিলেন। তারপরে কিছু ফল-মূল। তারপরে পাশে দাঁড়িয়ে পাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

স্বামী একটু সুস্থ হতে তাড়াতাড়ি ভিক্ষে নিয়ে বাইরে এলেন।

লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, আমার অপরাধ মার্জনা করুন ঠাকুর। এখনই দূর দেশ থেকে আমার স্বামী এলেন। তাঁর পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকায় আমার কিছু বিলম্ব হয়ে গেল। সেজন্যে মনে কিছু করবেন না।

কিন্তু কৌশিক রাগে অগ্নিশর্মা। ব্যঙ্গভরে বলে উঠল:

—বাইরে অতিথিকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে স্বামী-সেবা করা কোন্ গৃহিণীর কর্তব্য? মার্জনা চাইতে আপনার লজ্জা করছে না?

কৌশিকের দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে উত্তরের জন্যে সে সুব্রতার দিকে চাইলে।

সুব্রতা হেসে ফেললেন। বললেন, একটা বক মেরে আপনার ধারণা হয়েছে বোধ হয় যে,

আপনি যার দিকে চাইবেন আপনার দৃষ্টিতে সেই ভস্ম হয়ে যাবে। নয়? কিন্তু আমাকে আপনি ভস্ম করতে পারবেন না।

কৌশিক তো অবাক।

জিজ্ঞেস করলে, আমার দৃষ্টিতে যে একটা বক মারা গেছে, এ আপনি জানলেন কি করে?

সুব্রতা সবিনয়ে বললেন, একান্ত মনে স্বামীকে সেবা করে সামান্য কিছু কিছু শক্তি আমার হয়েছে।

—তাই? একান্ত মনে স্বামী-সেবা করলেই ক্ষমতা জন্মায়?

—দেখুন, যার যা ধর্ম সেই ধর্ম একান্ত মনে পালন করলেই কিছু ক্ষমতা জন্মায়। আমি গৃহস্থ বধূ। আমার ধর্ম স্বামী-সেবা। সেই ধর্ম পালন করতে গিয়েই আপনার ক্রোধের ভাজন হয়েছি। আমাকে মার্জনা করুন। দয়া করে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

কিন্তু ভিক্ষা সম্বন্ধে কৌশিকের আগ্রহ তখন চলে গেছে। সে জানতে চায়। জানতে চায়, কি করে সামান্য গৃহস্থ-বধূ সুব্রতা এই অসামান্য দৃষ্টিশক্তি লাভ করলেন।

জিগ্যেস করলে, আপনি তপস্যা করেন না?

—স্বামী-সেবাই আমার একমাত্র তপস্যা।

—তাছাড়া আর কোনো তপস্যা করেন না?

—না।

কৌশিক সেইখানে বসে পড়ল।

তাকে দেখে সুব্রতার দয়া হল। বললেন, দেখুন, দীর্ঘ বারো বৎসরের তপস্যায় মাত্র একটি বককে দগ্ধ করবার ক্ষমতা আপনি লাভ করেছেন। তার বেশি আর কিছুই পাননি। কেন পাননি, এ প্রশ্ন আসেনি?

—না। এইটুকু শক্তি লাভ করেই আমার অহংকারের সীমা ছিল না। সেই অহংকার আপনি চূর্ণ করে দিলেন। এখন বলুন, কেন তার বেশী আর কিছুই আমি পাইনি।

একটু ভেবে সুব্রতা বললেন, আমার সন্দেহ হয়, যে পথে আপনি তপস্যা করেছেন তা হয়তো আপনার স্বধর্ম নয়।

কৌশিক তখন ব্যাকুল হয়ে বললে, তাহলে কি ভাবে তপস্যা করলে আমি সিদ্ধি পেতে পারি, সেই উপদেশ দিন।

—না।—সুব্রতা বললেন,—আপনাকে উপদেশ দিতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। যে নিজে যথেষ্ট শক্তির অধিকারী না হয়ে অন্যকে উপদেশ দিতে যায়, সে নিজেরও ক্ষতি করে, অন্যেরও ক্ষতি করে। আমি অনধিকার চর্চা করি না। আপনি বরং এক কাজ করতে পারেন।

—কি কাজ বলুন।

—মিথিলায় ধর্মদাস নামে এক ব্যাধ আছেন। তাঁকে সবাই ধর্মব্যাধ বলে। তিনি আপনাকে প্রকৃত উপদেশ দিতে পারেন।

কৌশিকের মনটা দমে গেল: ব্যাধ! মুনি নয়, ঋষি নয়, ব্যাধ! তিনি দেবেন প্রকৃত উপদেশ!

সুব্রতা হেসে বললেন, হ্যাঁ দ্বিজবর, আমি জানি তিনি মানুষকে প্রকৃত উপদেশ দেবার শক্তি রাখেন।

কৌশিকের মনের সংশয় দূর হল না। জিগ্যেস করলে, তিনি কি খুব পণ্ডিত লোক?

—না বোধ হয়।—সুব্রতার ঠোঁটে তেমনি রহস্যময় মিষ্টি হাসি,—বইতে অনেক জ্ঞানের কথা থাকে। তেমনি বই যাঁরা অনেক পড়েছেন তাঁদেরই আমরা পণ্ডিত বলি। ধর্মব্যাধ ব্যাধের ছেলে। বই পড়ার সুযোগ তিনি পাবেন কোথায়? কিন্তু ধর্মের যে তত্ত্ব, যা সব পণ্ডিতেও জানেন না, তা তিনি জানেন। তাঁর ভেতরে শক্তি রয়েছে। আপনি তাঁর কাছে যেতে পারেন।

কৌশিক ভাবতে ভাবতে সুব্রতার কাছ থেকে চলে এল। ধর্মদাস ব্যাধের ছেলে এবং লেখাপড়াও জানেন না, এই কথায় তার মন খুশি হয়নি। কিন্তু সুব্রতাকে তার ভালো লেগেছে। তাঁর কথাও খুব জ্ঞানগর্ভ। সুতরাং ধর্মদাস যেমনিই হোন, সুব্রতা যখন বলছেন, তখন একবার গিয়ে দেখতে ক্ষতি কি? ভালো লাগে ভালো, না লাগে তাতেই বা কি? তখন বরং অন্য গুরুর খোঁজ করা যাবে। এই মনে করে একদিন সে মিথিলা যাত্রা করলে।

অনেক নদ-নদী, পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে অবশেষে কৌশিক মিথিলা রাজ্যে উপস্থিত হল। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই সে ধর্মব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করে। কেউ তাঁকে জানে, কেউ জানে না, কেউ হয়তো তাঁর নামই শোনেনি। সব চেয়ে আশ্চর্য দূরের লোকেরা হয়তো বা তাঁর নাম শুনেছে। শুনেছে ব্যাধ হলেও লোকটি ধার্মিক। কিন্তু কাছের লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

ধর্মব্যাধ? ব্যাধের খবর কে রাখে?—নাক সিটকে এই রকম উত্তরই বেশির ভাগ লোক দেয়।

কেউ বা কৌশিকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সবিস্ময়ে জিগ্যেস করে, আপনাকে তো ব্রাহ্মণ বলে মনে হচ্ছে? ব্যাধের সঙ্গে কি দরকার বলুন তো?

—শুনেছি, তিনি নাকি খুব জ্ঞানী লোক।

কৌশিক থতমত খেয়ে উত্তর দেয়।

—ব্যাধ, জ্ঞানী লোক! কি জানি মশাই, আমরা তো সে মহাপুরুষের সম্বন্ধে কিছুই শুনিনি। ব্যাধপল্লীতে জিগ্যেস করুন, তাদের গুরু-টুরু কেউ হতে পারে। তারা বলতে পারে।

ব্যাধপল্লীতেও ধর্মব্যাধের কথা কেউ জানে না। তবে এক ধর্মদাসের কথা তারা জানে, বাজারে মাংস বিক্রি করে। সে যদি হয়, তাহলে বাজারে গিয়ে খোঁজ করতে হবে।

বাজারে? কৌশিক রীতিমত ঘাবড়ে যায়। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান, বারো বছরের তপস্যায় কিছু শক্তিও সে পেয়েছে! মাংসের দোকানে যাওয়া তার উচিত হবে কি?

কিন্তু ধর্মব্যাধকে পেতে গেলে মাংসের দোকানে যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি?

অতএব কৌশিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও খোঁজ করতে করতে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

দোকানের সামনে গিয়ে কৌশিক কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে এক বীভৎস ব্যাপার!

দোকানের বাইরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ, হরিণ এবং ছাগলের মুণ্ডহীন দেহ ঝুলছে। রক্তে, চর্বিতে এবং হাড়ের টুকরোয় জায়গাটা ভর্তি। তা থেকে একটা উৎকট গন্ধ বার হচ্ছে।

আর কী লোকের ভিড় ! কত দুর-দুরান্তর থেকে লোক এসেছে মাংসের জন্যে। ধর্মব্যাধের দেহ রক্তে ও চর্বিতে আপ্লুত। রক্তাক্ত হাতে ছোরা নিয়ে তিনি মাংস কাটছেন এবং বিক্রি করছেন। ধার্মিক বলা দূরে থাক, তাঁকে দেখে কেউ পশুহন্তা দুর্বৃত্ত ছাড়া আর কিছু মনে করবে না।

দোকান থেকে অল্প দূরে রাস্তার উপর কৌশিক স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে। তার পা যেন মাটির মধ্যে বসে গেছে।

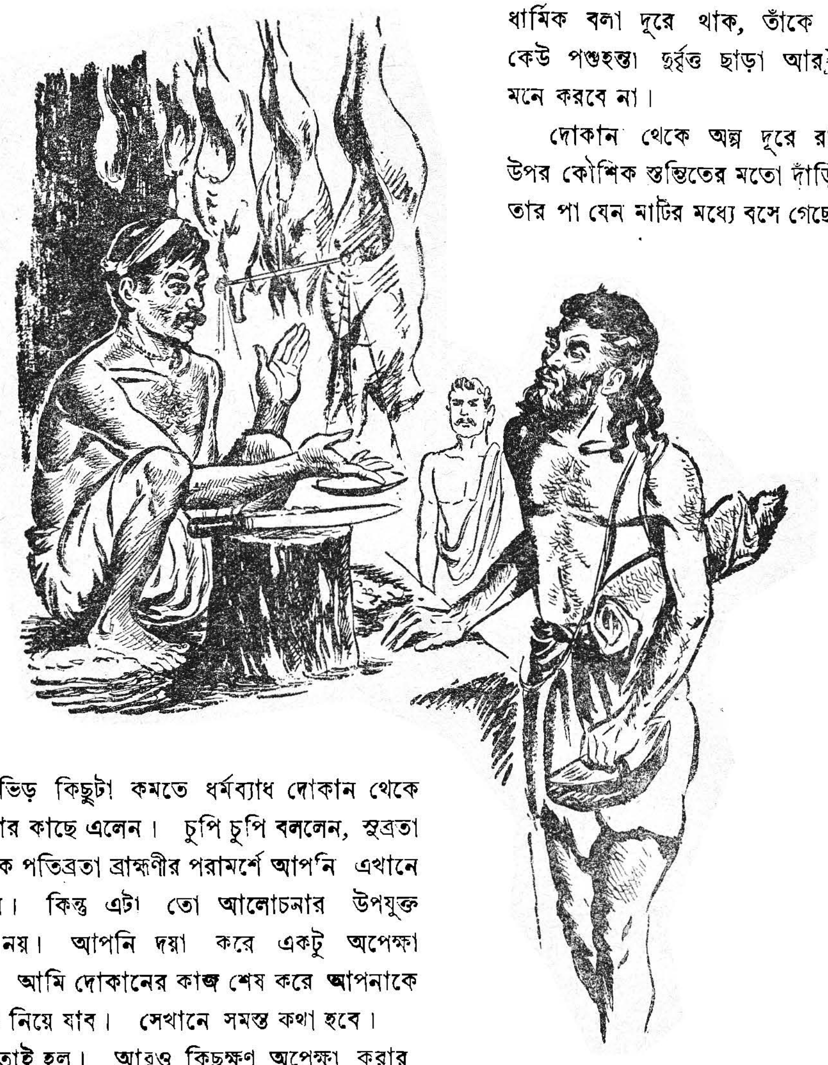

…কৌশিক স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে।

ভিড় কিছুটা কমতে ধর্মব্যাধ দোকান থেকে নেমে তাঁর কাছে এলেন। চুপি চুপি বললেন, সুব্রতা নামে এক পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর পরামর্শে আপনি এখানে এসেছেন। কিন্তু এটা তো আলোচনার উপযুক্ত জায়গা নয়। আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি দোকানের কাজ শেষ করে আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাব। সেখানে সমস্ত কথা হবে।

তাই হল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধর্মব্যাধ দোকান বন্ধ করে কৌশিককে বললেন, চলুন আমার বাড়ি।

পথ চলতে চলতে কৌশিক জিগ্যেস করলেন, একটা কথা জানতে চাই।

—আদেশ করুন।

—সুব্রতা বলেছেন আপনি পরম ধার্মিক এবং জ্ঞানী। তাহলে মাংস-বিক্রির মতো পাপ কাজ করছেন কেন? প্রাণী-হত্যা এবং মাংস-বিক্রি তো শাস্ত্রমতে অতি গর্হিত কাজ।

ধর্মব্যাধ হেসে বললেন, আমি সেটা স্বীকার করি না। প্রাণীর দেহ ছাড়া প্রাণীর প্রাণরক্ষার কোনো উপায় নেই। ধান, গম, শাকসব্জিরও প্রাণ আছে। তারাও মৃত কিংবা নিষ্প্রাণ নয়।

কৌশিক এ কথার প্রতিবাদ করতে না পেরে চুপ করে রইল।

ধর্মব্যাধ বলতে লাগলেন, তা ছাড়া মাংস-বিক্রি আমাদের কুলধর্ম। ছেলেবেলা থেকে এই কাজই আমি শিখেছি।

কৌশিক তখন জিগ্যেস করলেন, আমি বারো বছর তপস্যা করে একটিমাত্র বককে দগ্ধ করার শক্তি পেলাম, আর কিছুই না করে সুব্রতা আমার চেয়েও বেশি শক্তি লাভ করলেন কি করে, এইটে আমাকে বলুন।

ধর্মব্যাধ হেসে বললেন, বিনা তপস্যায় কিছুই লাভ হয় না। আপনি মনেও করবেন না, বিনা তপস্যায় সুব্রতা অতখানি শক্তি লাভ করেছেন।

—কিন্তু তিনি তো গৃহী। তপস্যা তো করেন না।

ধর্মব্যাধ আবারও হাসলেন। বললেন, করেন। শুধু বনে গিয়ে ভগবানকে ডাকলেই তপস্যা করা হয় না। যে যেখানে আছে, সে সেইখানে থেকেই তপস্যা করতে পারে।

—কি করে?

—ছাত্রের তপস্যা লেখাপড়ায়। সেই তার স্বধর্ম। গৃহীর তপস্যা গৃহে থেকে নিজের গৃহধর্ম শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং সাধুতার সঙ্গে করে যাওয়া। তার সেইটেই ধর্ম। সুব্রতা একান্তমনে তাই করেছেন এবং তারই বলে অত শক্তি লাভ করেছেন।

কৌশিক বললে, বেশ। তাই যেন হল। কিন্তু আমি অত কম ফল পেলাম কেন?

—কারণ, আপনি বৃদ্ধ পিতামাতাকে ছেড়ে এসে আপনার স্বধর্ম ত্যাগ করেছেন।

—স্বধর্ম আপনি কাকে বলেন?

ধর্মব্যাধ বললেন, শুনুন। চারপাশের অবস্থা এবং সময় যখন যে কর্তব্য নির্দেশ করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই কর্তব্য করে যাওয়াকেই আমি স্বধর্ম বলি। গৃহে থেকে বৃদ্ধ বাপ-মায়ের সেবা করাই ছিল আপনার স্বধর্ম। সেই তপস্যায় আপনি আরও সহজে আরও বেশি শক্তি লাভ করতে পারতেন।

কৌশিক বললেন, আপনি কি তাহলে আমাকে ঘরে ফিরে যেতে উপদেশ দেন?

ধর্মব্যাধ বললেন, হ্যাঁ। সেই হবে আপনার সত্যকার তপস্যা।

সে রাত্রি ধর্মব্যাধের আতিথ্য গ্রহণ করে কৌশিক ঘরে ফিরে গিয়ে একান্তমনে বাপ-মায়ের সেবা করতে লাগলেন—এবং তার ফলে পরবর্তী কালে তিনি পরম ধার্মিক বলে বারানসী অঞ্চলে বিখ্যাত হন।

রাজভোগ

—রবিদাস সাহা রায়

অনেকদিন থেকে সিংহই বনের রাজা হয়ে আসছে। বাঘ, মোষ, হাতী, তারা কত চেষ্টাই না করল বনের রাজা হতে। কিন্তু কেউ পারল না।

মশার একদিন ইচ্ছা হল বনের রাজা হবে। সে ভাবল—ছোট হলেও বীরত্ব কি আমার কম? বড় বড় লোকদের কামড়ে ঘায়েল করি। থাপ্পড় মারবার আগেই ভোঁ করে উড়ে পালাই। হাতী, বাঘ, মোষ সবাই আমার কামড়ের জ্বালায় ছটফট করে। শুধু কি তাই? আমি ভ্যান ভ্যান করে গানও গাইতে পারি। সিংহের চেয়ে গুণ কিসে আমার কম? কেন আমি বনের রাজা হতে পারব না?

রক্ত খেতে খেতে একঘেয়ে লাগছে। রাজা হলে নানারকম রাজভোগ খাওয়া যাবে। মুখের স্বাদটাও বদলানো যাবে।

এই না ভেবে মশা গুন গুন করে গান করতে করতে চলল বনের দিকে। যেতে যেতে এক বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। দেখল বিরাট এক হাতী পা ছড়িয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে আছে। মশা ভাবল—এত বড় হাতী, কি বিরাট তার ভুঁড়ি, ও রাজা হচ্ছে না কেন? ওর কাছ থেকে সব জেনে নিতে হবে। তা হলে হয়ত আমার রাজা হওয়ার সুবিধা হবে।

মশা কাছে গিয়ে তাকে ডাকল—হাতি মশাই, ও হাতি মশাই?

হাতী সবেমাত্র খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছে। কাজেই মশার ডাক সে শুনতে পেল না।

মশা আবার ডাকল—হাতি মশাই, ও হাতি মশাই, শোনো—

কিন্তু হাতী কিছুতেই উঠছে না। তখন মশা তার মস্ত বড় কানের ভিতর ঢুকে গান সুরু করল—ভ্যান্-ভ্যান্-ভ্যান্ প্যান্-প্যান্-প্যান্।

হাতী এবার আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল। বলল—কে রে, আমার এমন তোফা ঘুমটা দিলে ভেঙে?

মশা বলল—হাতি মশাই, আমি মশা।

হাতী বলল—অসময়ে আমার ঘুম ভাঙালি কেন রে?

মশা বলল—একটি খবর আছে হাতি মশাই।

—কি খবর?

—খবরটা হল এই। সিংহ অনেককাল ধরে বনের রাজা হয়ে আসছে। আমরা ভেবেছি তোমাকে এবার রাজা করব।

হাতী আর একটু আরামে পা ছড়িয়ে শুয়ে বলল—ওসব রাজা ফাজা হওয়া আমার পোষাবে না। এই বেশ আছি। এখন যা তো আমার কাছ থেকে, আরামে একটু ঘুমোই।

মশা বলল—আহা, রাগ করছ কেন? তুমি যদি রাজা না-ই হও, তা হলে আমিই রাজা হই—কি বলো?

কথা শুনে হাতীর ঘুমের নেশাটা চট্ করে যেন ছুটে গেল। পিট পিট করে চেয়ে বলল—কি বললি, তুই রাজা হবি? পুঁচকে মশা, তোর এত সাহস?

—কেন, হতে দোষ কি?

—যাঃ, মারব থাপ্পড়।

—ইস্, মারো তো দেখি। বলেই মশা কানের ভেতর ঢুকে আবার সুরু করল —ভ্যান্ ভ্যান্ ভ্যান্।

হাতী বলল—আহা জ্বালাস্ নে। যা বলছি। ঘুমুতে দে।

মশা কোন কথাই শুনল না। আবার সুরু করল—ভ্যান্ ভ্যান্ ভ্যান্।

হাতী ওকে শুঁড় দিয়ে তেড়ে মারতে গেল। কিন্তু ছোট্ট মশা, ধরবে কেমন করে? এ কান থেকে তাড়ায় তো ও কানে গিয়ে ঢোকে, আবার ও কান থেকে তাড়ায় তো এ কানে এসে ঢোকে।

হাতী বলল—আঃ কি জ্বালাতন! তুই কি চাস বল্। ঘুমুতে দে আমাকে।

মশা বলল—বললাম আমি বনের রাজা হব, তুমি আমাকে রাজা বলে স্বীকার করবে তো?

হাতী দেখল মহা জ্বালাতন! আরামে ঘুমুতে দেবে না। তাই বলল—যা বাপু যা, স্বীকার করছি তুই বনের রাজা। এখন ঘুমুতে দে।

মশা মহাখুশী হয়ে উড়ে চলল বনের ভেতরের দিকে। ভাবল হাতী যখন স্বীকার করেছে তখন আমার রাজা হওয়া আর আটকায় কে? মনের আনন্দে সে গান গাইতে সুরু করল—ভ্যান্ ভ্যান্ ভ্যান্।

এমন সময় দেখা হল এক বাঘের সঙ্গে। বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার কানের কাছে গিয়ে ভ্যান্ ভ্যান্ করে গান জুড়ে দিল। বাঘ জিজ্ঞেস করল—কে রে তুই?

মশা জবাব দিল—আমি মশা, বনের রাজা।

কথা শুনে বাঘ মশায়ের দু'চোখ একেবারে ছানাবড়া! আবার জিজ্ঞেস করল—কি বললি? তুই বনের রাজা?

—হ্যাঁ, জানো না? হাতী পর্যন্ত মেনে নিয়েছে আমাকে রাজা বলে।

—তাই নাকি ? বামন হয়ে চাঁদ ধরবার মতলব ! এক থাপ্পড় মারলে আর এক থাপ্পড় মারবার জায়গা নেই—সে হবে বনের রাজা ?

—ইস্, মারোই না থাপ্পড়। বলেই মশা কুটস করে এক কামড় বসিয়ে দিল বাঘের পিঠে।

বাঘ মশাটাকে মারবার জন্যে লেজ দিয়ে মারল এক বাড়ি। কিন্তু মশা ভোঁ করে উড়ে ছুটে পালাল। যাবার সময় বলল—পেন্নাম হই বাঘ মশাই, পারলে না তো আমাকে মারতে ? আমি সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে চললাম।

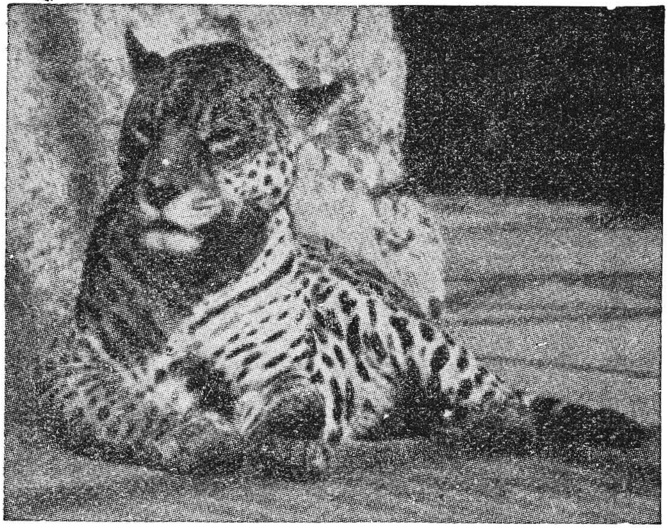

কে রে তুই ? [পৃষ্ঠা—১৭

মশা ঘুরতে ঘুরতে গভীর জঙ্গলে এসে পৌঁছল। তখন রাত হয়ে গেছে। ছুটে ছুটে একটু ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল। তাই ভাবল—একটু ঘুমিয়ে নি।

গাছের একটা পাতার উপর বসে ডানা দু'টিকে গুটিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমুতে লাগল। কিছুক্ষণ পর কিসের আওয়াজে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল।

ধীরে ধীরে সেই শব্দ কাছে এগিয়ে এল। ঘুমন্ত জন্তু-জানোয়াররা ঘুম থেকে উঠে জড় সড় হয়ে বসে পড়ল। কেউবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ব্যাপার ! কি ব্যাপার !

বনে সোরগোল উঠল—বনের রাজা আসছে, বনের রাজা আসছে—পথ ছাড়ো। খাবার দাবার যোগাড় করো।

মশা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বুঝতে পারল—সিংহ আসছে।

বাবাঃ, বনের রাজার তো কম সমাদর নয়। সে রাজা হলে তাকেও তো সবাই এমনি পরোয়া করে চলবে। রাজভোগ খেতে দেবে।

এদিকে বিকট আওয়াজ করতে করতে সিংহ মশাই এসে হাজির হল। এসে বসল মশার কাছাকাছি এক জায়গায়। বসে আবার বিকট আওয়াজ করে ডাকতে

লাগল। পশু-পাখিরা সব তার ভয়ে কাঁপতে লাগল। কেউ কাছে এসে তাকে পেন্নাম করল। কেউ নিয়ে এল নানারকম খাবারের ভেট।

এসব দেখে মশার কিন্তু ভারী রাগ হল। সে ভাবল—দিই আমার বাহাদুরিটা ওকে দেখিয়ে। এই না ভেবে সে সিংহের কাছে গিয়ে ভ্যান্ ভ্যান্ করে গাইতে সুরু করল—

সিংহ মশাই, সিংহ মশাই
করছ তুমি কি,
দেখ আমি কেমন মজার
গান শিখেছি।

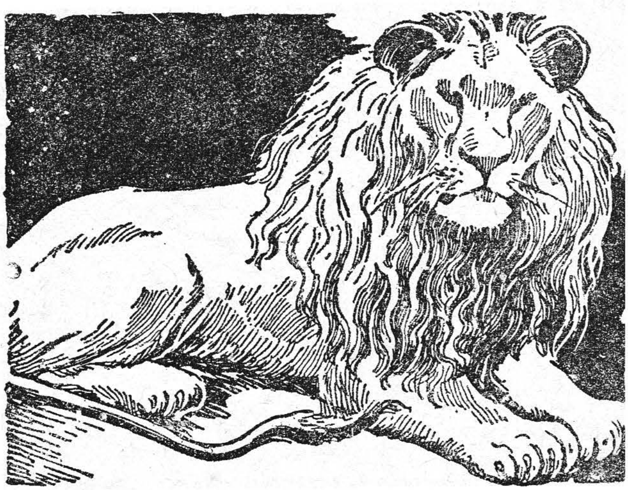

জানিস আমি বনের রাজা!

সিংহ অমনি রেগে গিয়ে বলল—কে রে, আমার কাছে এসে বাহাদুরি করছিস?

মশা বলল—আমাকে চেনো না? আমার নাম শ্রীমশক সিং রাজা বাহাদুর।

সিংহ ক্ষেপে উঠল। বলল—কি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস? জানিস আমি বনের রাজা!

মশা বলল—ইস্, কে তোমাকে রাজা বলে? আজ থেকে বনের রাজা হচ্ছি আমি। তোমার চেয়ে অনেক বেশী গুণ আছে আমার। আমি গান করতে পারি, কামড়িয়ে সবাইকে কাবু করতে পারি আর ভয়ানক জোরে উড়তে পারি আমি। ছুটে ধরতে পারবে আমাকে?

সিংহ বলল—ছ্যাখ্ পুঁচকে মশা। এক চড় মেরে তোকে চেপ্টা করে দেব।

মশা বলল—ছ্যাখো, সাবধানে কথা বলো। হাতী পর্যন্ত আমাকে বনের রাজা বলে মেনে নিয়েছে, জানো?

সিংহ ভয়ানক রেগে উঠল। বলল—আয় কাছে আয়, তোকে মজা দেখাচ্ছি।

মশা অমনি ভ্যান্ ভ্যান্ করে সিংহের নাকের কাছে উড়ে গেল। বলল—

সিংহ মশাই সিংহ মশাই
করবে আমায় কি?
এখন থেকে আমিই বনের
রাজা হয়েছি।

সিংহ এদিকে ঘোরে, ওদিকে ঘোরে—কিন্তু মশাকে ধরতে পারে না। মশা সিংহের নাকে কামড় দিয়েই উড়ে পালায়, আবার খানিক বাদেই নাকের উপর এসে বসে।

সিংহ রেগেই অস্থির। এতটুকু একটা মশা তাকে এমন অপদস্থ করছে? দাঁড়া ত!

সিংহ রেগে মশার দিকে তেড়ে গেল। আর মশা করল কি জান? ফুড়ুৎ করে সিংহের নাকের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর ঢুকে আচ্ছা করে কামড়াতে লাগল।

কামড় খেয়ে সিংহ যন্ত্রণায় অস্থির। তার উপর নাকে সুড়সুড়ি লেগে হাঁচতে লাগল—হ্যাচ্চা—হ্যাচ্চো।

হাঁচির হাওয়া লেগে মশা বাইরে ছিটকে পড়ল। আবার ভিতরে ঢুকে দিল কামড়।

সিংহ বলল—ছ্যাখ্ মশা, ঠাট্টা করিস না। এখন ঠাট্টার সময় নয়।

মশা বলল—ছিঃ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করব কেন? আমাকে রাজা বলে মেনে নাও, তা হলে এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি। বলে অমনি নাকের ভেতর আর এক কামড়।

সিংহ নাকের চুলকানিতে ছটফট করতে লাগল। কাছেই ছিল একটা কাঁটা-ওয়ালা মাদার গাছ। চুলকানি কমাবার জন্যে সেটাতেই গেল নাক ঘষতে। নাক একটু ঘষেছে কি—ব্যস্। নাক চিরে দর দর করে রক্ত বেরুতে লাগল।

রাগে দুঃখে অভিমানে সিংহ এবার দিল ছুট্। বন পেরিয়ে—মাঠ ছাড়িয়ে কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না।

মশার ভারী ফুর্তি হল। বনের রাজা সিংহকে সে হারিয়ে দিয়েছে। সিংহ পালিয়ে গেছে বন ছেড়ে। এখন সেই বনের রাজা। তাকে আর পায় কে?

আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল মশা। মনের সুখে গলা ছেড়ে গান ধরল—ভ্যান্ ভ্যান্।

চেঁচিয়ে বলতে লাগল—এসো সব বনের পশু-পাখিরা। আমিই এখন বনের রাজা। আমাকে তোমরা পেন্নাম কর, আমাকে পূজো দাও।

এমন সময় হয়েছে কি, একটি মাকড়সা কাছেই একটা গাছের ডালে বসে বসে জাল বুনছিল আর মশার কাণ্ডকারখানা দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল।

মশার কোন হুঁশ ছিল না। সে মনের আনন্দে গান করছিল আর উড়ে বেড়াচ্ছিল। উড়তে উড়তে সে যেই মাকড়সার জালের কাছে গেল, আর অমনি পড়ল আটকে। যতই সে জাল থেকে নিজকে ছাড়াবার চেষ্টা করে, ততই জালের মাঝে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়।

মাকড়সা তখন কাছে এগিয়ে এসে বলল—রাজা মশাই, পেন্নাম হই, কি খবর?

মশা বলল—এই তোমার জালে একটু আটকে গেছি, খুলে দাও তো ভাই।

মাকড়সা বলল—এই যে দিচ্ছি, আগে জলযোগটা সেরে নিই।

মশা চেঁচিয়ে বলল—বাঃ, সে-কি কথা ? জলযোগ করবে আমাকে দিয়ে ?

মাকড়সা বলল—শুধু কি জলযোগ ? আপনি রাজা হয়েছেন, আপনাকে খেলে রাজভোগ খাওয়া হল আমার।

বলেই মাকড়সা মশাটাকে টপ্ করে একেবারে মুখে পুরে ফেলল।

খাবি কি ?

—শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত

ওরে ভোঁদা শুনেছিস্ ?
চোখ চেয়ে দেখেছিস্ ?
তিন-চাঁদ আকাশেতে বাঁই বাঁই ঘুরছে ?
একটা তো আগেকার
আর দুটো রাসিয়ার ;
তিন মিতা আকাশেতে সাঁই সাঁই উড়ছে ?
যতেক বৈজ্ঞানিক
দাড়ি নেড়ে বলে ঠিক ;
বেড়াতে যাওয়া চাঁদে এইবার চলবে !
সেথা যত প্রাণী আছে…
হাটে, মাঠে, ঘাটে, গাছে…
আমাদের সাথে নাকি কথা তারা বলবে !
আমি ব'লি ভারি মজা—
চল্ ভোঁদা চল্ সোজা
সেখানেই চলে যাই, কি বলিস্ ? যাবি কি ?
সারাদিন খেল্‌লেও
বল্‌বে না কিছু কেও,
কিন্তু ভাবছি ভাই সেথা গিয়ে খাবি কি ?

নিতাই

—শ্রীরামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মেঘলা দিন। দু' এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। স্কুল ছুটির পর নিজের রুমে খাটিয়ার উপর শুয়ে বিশ্রাম করছি। এমন সময় কে দরজা খুলে ঘরে এল। চেয়ে দেখি—চার পাঁচ জন ছেলে। জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যাপার কি?' সমস্বরে তারা বলে উঠলো—'নিতাইএর কাণ্ড দেখুন সার, কোথেকে একটা আধমরা বোবা লোককে নিয়ে এসে তুলেছে বোর্ডিং-এর বারান্দায়।'

ব্যাপার কি দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বোর্ডিং-এর সামনে এসে দেখলাম—সত্যই একটা জীর্ণ-শীর্ণ লোক বারান্দার এক কোণে বসে কাঁপছে। নিতাই নেই, তারই জন্যে কোন কিছু আন্‌তে কোথাও গেছে বুঝি। আমাকে দেখেই লোকটা কাঁপতে কাঁপতে ব'লে উঠল 'দেঁ—দেঁ—দেঁ!' অব্যক্ত ভাষা! কিছু বুঝতে পারলাম না। ততক্ষণে প্রায় সকল ছেলেই এসে তার সামনে ভিড় জমিয়েছে। লোকটা আবার আমার দিকে চেয়ে 'দেঁ—দেঁ'—ক'রে হাত পেতে কি যেন চাইলে। আমি কি দেব বুঝতে পারছি না। ছেলেরা হেসে উঠল। এমন সময় নিতাই এল, হাতে একটা পুরানো সতরঞ্জি আর একটা কাঁথা।

ছেলেরা তাকে দেখেই অভিযোগের সুরে বলল—'দেখুন সার! এই লোকটাকে এনে কেমন এখানে আস্তানা ক'রে দিচ্ছে। এতটুকু ঘেন্না নেই ওর, হাত ধরে নিয়ে এসেছে!'

নিতাই কারো কথায় কান না দিয়ে লোকটাকে সতরঞ্জিটা পেতে দিলে। লোকটা সরে বসল সতরঞ্জিটার উপর। তারপর কাঁথাটা লোকটার গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে নিতাই আমার দিকে চেয়ে বললে—'ভাগ্যিস্ আমি আসছিলাম ঐ বুড়ো বটগাছটার পাশ দিয়ে। দেখলাম গাছের তলে বসে লোকটা থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছে।

আমাকে দেখেই করুণস্বরে চিৎকার করে উঠল। কি যে বলে বোঝা যায় না! তবুও কেমন দয়া হয়। দেখলাম জল পড়ছে, রাত্তিরের দিকে বৃষ্টি আরো বেশিই হ'তে পারে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বেশি জল হলে লোকটা নিশ্চয়ই মারা যাবে; তাই ধরে নিয়ে এলাম।'

দু'চারজন ছেলে বলে উঠল—'এখানে একে থাকতে দেওয়া চলবে না সার! দেখছেন না খক্ খক্ ক'রে কাশছে। তা ছাড়া কি অপরিষ্কার, দেখলে ঘেন্না হয়।'

নিতাই বললে—'তোরা চুপ্ কর। একে এখানেই রাখতে হবে। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, এখন এ কোথায় যাবে? তাড়াতাড়ি চলতে পারে না। তার ওপর জ্বর এসেছে, বাইরে থাকলে বেচারী নিশ্চয় মারা যাবে।'

সত্যিই লোকটার অবস্থা দেখলে দয়া হয়। আমি কাউকে কিছু না ব'লে ধীরে ধীরে নিজের রুমে চলে এলাম। দু'জন ছেলে আমার পিছু পিছু এসে জিজ্ঞাসা করলে—'লোকটা কি এখানেই থাকবে সার?'

আমি বললাম—'আজ রাতটা থাক, কাল সকালে ওকে এখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করা যাবে।'

পরদিন ভোরে বিছানা থেকে উঠে দেখলাম—মেঘ কাটেনি। আগের দিনের মতই ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি ঝরছে। নিতাই সেই জলের মধ্যেই লোকটাকে ধরে নিয়ে চলেছে বোর্ডিং থেকে একটু দূরে খড়ো ঘরটার দিকে। ঐ ঘরটায় আগে প্রাইমারী স্কুল বসত এখন বিল্ডিং হওয়ায় ওর আদর কমে গেছে। শীঘ্রই ওটাকে ফেলে দেওয়া হবে,—তাই এবৎসর আর মেরামত করা হয়নি। ঘরটায় জল পড়ে তবে সব জায়গায় নয়। নিতাই লোকটাকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল—একটা শুকনো কোণে তার বিছানা পেতে দেবে নিশ্চয়।

হাত মুখ ধুয়ে একটু চা নিয়ে বসেছি—নিতাই এল। জিজ্ঞাসা করলাম—'খবর কি নিতাই?'

'লোকটার জ্বর ছাড়েনি সার?'

আমি বললাম—'তা কি করবে বল?'

'কোন ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হ'ত না?'

নিতাই জানে আমার কাছে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ থাকে। আমি বললাম—'দেখ নিতাই, ওষুধ আমি দিচ্ছি, কিন্তু—'

'চিন্তা নেই সার, আমি ঠিক ঠিক সময়ে ওকে খাইয়ে দেব।'

নিতাইএর দিকে চোখ তুলে চেয়ে বললাম—'খাইয়ে দিতে পারবে তা আমি জানি; কিন্তু তোমার পড়ার ক্ষতি হবে না?'

'ক্ষতি',—আর বিশেষ কিছু বলতে পারে না নিতাই। চুপ্ করে থাকে, ফ্যালফেলিয়ে আমার দিকে তাকায়। আমি বুঝলাম তাকে এ বিষয়ে বাধা দেওয়া বৃথা। বললাম—'চল, তাই দেখে আসি। না দেখে তো আর ওষুধ দেওয়া চলবে না।'

নিতাই বেশ খুশী মনে বললে—'আসুন সার!'

গিয়ে দেখলাম লোকটা জ্বরে ধুকছে। বেশ জ্বর। আমাকে লোকটার কাছে যেতে দেখে দু'চারজন ছেলেও সেখানে এসে জুটল। তারা আমাকে বললে—'দেখুন সার, এই হতভাগাটাকে নিতাই গাছতলা থেকে এনে কেমন বিপদের সৃষ্টি করেছে। লোকটার অবস্থা দেখুন, হয় তো মারা যাবে। গাছের তলায় মরলে ক্ষতি ছিল না, শেয়াল-শকুনে টেনে খেত; কিন্তু এখানে মরলে টেনে ফেলবারও লোক জুটবে না। কি জাত তার ঠিক নেই। কে ছোঁবে? নিতাই-এর ঘেন্না নেই, বামুনের ছেলে হয়ে অনবরত ওকে ছুঁচ্ছে!'

আমি ছেলেদের কথায় বিশেষ কান না দিয়ে চলে এলাম। নিতাই এল ওষুধ নিতে আমার সাথে। তার হাতে এক পুরিয়া ওষুধ দিয়ে বললাম তখনই খাইয়ে দিতে। পরে দেখে শুনে আবার ব্যবস্থা করা যাবে। নিতাই চলে গেল।

স্কুল-ছুটির পর নিজের রুমে এসেছি। পরিশ্রান্ত দেহটাকে খাটিয়ার উপর এলিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করছি এমন সময় আবার নিতাই এল। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই নিতাই উদ্বেগের সঙ্গে বললে—'লোকটার অবস্থা বড্ড খারাপ সার। হয়তো রাত্রেই মারা যাবে।'

আমি উদাসীনভাবে বললাম—'মারা গেলেই আর কি করবে বল?' নিতাই কিছুই উত্তর দিতে পারে না। মনে মনে সেও বুঝেছে—করবার কিছুই নেই। আমি নিতাই-এর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রোগীর দু'চারটা লক্ষণ জেনে নিলাম। তারপর একটা ওষুধ দিয়ে তাকে বিদায় করলাম।

খাটিয়ায় শুয়ে মনে মনে চিন্তা করে চলেছি—নিতাইএর সম্বন্ধে। সাত আট ক্রোশ দূরে ওর বাড়ি। ওকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি এক বুড়ো মা ছাড়া আর ওর কেউ নেই। ওকে খুব ছোট রেখেই ওর বাবা মারা গেছেন। বহুকষ্টে মা নিতাইকে বড় ক'রে তুলেছেন। মায়ের বড় সাধ—নিতাই লেখাপড়া শিখে বড় চাকরি করবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। তাই নিকটে কোন স্কুল না থাকায় এতদূরে একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখবার জন্যে পাঠিয়েছেন। নিতাই-এর কথায় বেশ জেনেছি—সে মাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। কিন্তু মায়ের কথামত শুধু লেখাপড়া নিয়ে থাকতে সে রাজী নয়। মড়া-পোড়ানো, রোগীর শুশ্রূষা, বন্যা-রিলিফ—এসব নিয়ে সে অনেক সময়

কাটায়। এজন্য এখানে আমাদের কাছে বকুনি খায়, বাড়ি গেলে মায়ের কাছে বকুনি খায়। তবু নিজের পথ সে বদলায় না।

তাকে জিজ্ঞাসা করেছি—'নিতাই তুমি এখানে থাক, তোমার বুড়ো মায়ের দেখাশোনা করে কে?' নিতাই হেসে উত্তর দিয়েছে—'কেন সার, আমার নীলু দা আছে, সেই মায়ের দেখাশোনা করে।'

নীলু তাদের বাড়ির পুরানো চাকর। তার বাপের আমল থেকে তাদের বাড়িতে কাজকর্ম করে, তাদের বাড়িতেই থাকে। ঐ গাঁয়েই তার বাড়ি। ছেলেপিলে ঘর-সংসার সবই তার আছে ; কিন্তু সে নিজের ঘরের কিছুই দেখে না। নিতাইদের ঘরেই থাকে,—তাদের সব কিছু দেখাশোনা করে। সব কিছু আর কি? নিতাই-এর বুড়ী মায়ের ফাইফরমাস্ শোনা আর রাত্তির বেলায় নিতাইদের ঘর আগলে পড়ে থাকে।

নিতাই মাঝে মাঝে ঘরে যায়। স্কুলে আসবার সময় নীলু বলে—'কোন চিন্তা কর না ভাই, আমি মায়ের কোন অসুবিধা হতে দেব না।'

নিতাই-এর কথাই ভাবছি। হঠাৎ অনেকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর কানে এলো। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এসে দেখলাম—বোর্ডিংএর সমস্ত ছেলে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। স্কুলের সেক্রেটারী মশাই এসেছেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিতাই। বুঝলাম, ছেলেরা তাঁকে ডেকে এনেছে। নিতাইকে তিনি তিরস্কার করছেন তিক্তস্বরে ঐ পঙ্গু লোকটাকে গাছতলা থেকে কুড়িয়ে এনে স্কুলে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে। নিতাই সেক্রেটারী মশাইয়ের কোন কথার জবাব দিচ্ছে না, মাথা নীচু করে সকল তিরস্কার সহ্য করে চলেছে। মাঝে মাঝে ছেলেরা টিপ্পনী কাটছে নিতাই-এর বিরুদ্ধে। নিতাই নির্বাক্।

বেশ কিছুক্ষণ কিছু তিরস্কার ক'রে সেক্রেটারী মশাই নিতাইকে শেষ নির্দেশ দিয়ে গেলেন—আগামীকাল সকালেই সে যেন লোকটিকে অন্য কোথাও রেখে আসে, নইলে তিনি নিতাইকে স্কুল থেকে বিদায় দিতে বাধ্য হবেন। সেক্রেটারী মশাই চলে গেলেন।……

সন্ধ্যার সময় আবার নিতাই এল আমার কাছে। বললাম আমি—'কি নিতাই কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও না কি?'

'তেমন কিছু নয় সার! একটা কবিতার দুটো লাইন মনে আছে, কিন্তু কার লেখা মনে পড়ছে না, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম।'

আমি বললাম—'লাইন দুটো আবৃত্তি কর দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আবৃত্তি করল—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥"

'সি, আর দাশের লেখা নয় সার ?'

আমি বললাম—'না, স্বামী বিবেকানন্দের।'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে স্বামী বিবেকানন্দের লেখাই বটে। আপনার মুখ থেকেই একদিন শুনেছিলাম সার !'

নিতাই আনন্দিত মনে চলে গেল।

পরদিন সকালে উঠেই দেখলাম—সমস্ত ছেলে সেই খড়ো ঘরটার সামনে জড়ো হয়েছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়ে সেখানে গেলাম। আমাকে দেখেই কতকগুলি ছেলে সমস্বরে বলে উঠল—'লোকটা মরে গেছে সার ! হতভাগা নিতাই কেমন বিপদের সৃষ্টি করেছে দেখুন। এখন একে শ্মশানে নিয়ে যাবে কে ?'

সত্যই চিন্তার বিষয়। মৃতদেহটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার মত লোক এখানে মেলা সহজ নয়। যে পল্লীগ্রামে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মৃতদেহ সৎকারে লোক জোটানো কঠিন হয়ে পড়ে সেখানে একটা নাম গোত্রহীন লোকের মৃতদেহের কেউ যে সৎকার করতে আসবে—তা অসম্ভব।

ছেলেরা শুধু নিতাইএর দোষ দিচ্ছে। কিন্তু নিতাই কোথায় ? নিতাইকে না পেলে কোন যুক্তি স্থির হবে না। এই পঞ্চাশজন ছাত্রের মধ্যে একমাত্র ছাত্র যে এগিয়ে আসবে অপরিচিতের সৎকারে।

নিতাই এল। আমি বললাম—'নিতাই ! কি করবে এখন ?'

'আমিই নিয়ে যাচ্ছি সার। একাই পারব হতভাগাকে নিয়ে যেতে।'

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল নিতাই মৃতদেহের দিকে।

ছেলের দল গুঞ্জন করে উঠল। ছি ছি করে উঠল। তবু আমি উপস্থিত ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললাম—'কেউ নিতাই-এর সাথে গেলে ভাল হত না ? যাও না কেউ নিতাইয়ের সাথে।'

কারো সাড়া পাওয়া গেল না ; বরং একে একে সকলে সরে পড়ল। নিতাই বলল—কাউকে যেতে হবে না সার। আমি একাই পারব।'

মৃতদেহটিকে সতরঞ্জি মুড়ি দিয়ে কাঁধে তুলে শ্মশানের পথ ধরলো নিতাই !

সে টী চাক্তে!

—শ্রীঅলককুমার ঘোষ

"এমন ভুলো মন নিয়ে আপনি লড়াই করতেন কী ক'রে স্থয্যিদা?"—প্রশ্নটা করেছিল চায়ের আড্ডার সব চেয়ে ছোকরা মেম্বার ছট্টু মজুন্দার।

প্রশ্নটার উপলক্ষ এমন কিছু ছিল না। সূর্য রায় একটা আধুলি দিয়েছিলেন। তা থেকে সাড়ে ছয় আনা তাঁকে ফেরত দেওয়ার কথা। কিন্তু স্থফল চা-ওলা তখন উনুনে নতুন কয়লা চাপিয়ে ভাঙা পাখা দিয়ে জোর হাওয়া চালাচ্ছে, ফিরতি পয়সাটা 'দিচ্ছি-দেব' করতে করতে একসময়ে তাঁর কথা বিল্‌কুল ভুলে গিয়েছিল। সূর্য রায়ও গেলাসের চা শেষ করে ছেলেদের সঙ্গে দু'চারটে কথা কয়ে উঠে পড়লেন যখন, পয়সার কথা তাঁরও ছিল না খেয়াল।

চৌকাঠ পেরিয়ে ফুটপাত পেরিয়ে রাস্তায় যখন নামতে যাচ্ছেন সূর্য রায়, তখন স্থফল উনুনের পাশ থেকে লাফিয়ে উঠল—"দাদা যে পয়সা নিয়ে গেলেন না! বাজার করবেন কী দিয়ে?"

এ-আড্ডায় সবাই জানে যে রোজ সকালবেলা একটি আধুলি পকেটে নিয়ে সূর্য রায় ঘর থেকে বেরোন; তাঁর সারাদিনের সব-কিছু খরচা মেটাবার ভার থাকে ঐ এক এবং অদ্বিতীয় আধুলির উপর। কাজেই চায়ের দোকান থেকে ফিরতি-পয়সা ফেরত না নিয়ে বেরিয়ে পড়ার অর্থ হচ্ছে বাজার না-করা এবং তার ফলে আলুনি ভাত খাওয়া। নুন তেল সব্জি লঙ্কা সবই তিনি রোজকার রোজ কিনে থাকেন; তার দরুন তাঁর বাঁধা বাজেট আছে সাড়ে পাঁচ আনা। বাজার করে যখন তিনি ঘরে ফেরেন, তখন তাঁর পকেটে থাকে কুল্লে চারটি পয়সা, বিকেল বেলা স্থফলের দোকানে এক গেলাস চা খাওয়ার জন্যে।

ধার ? ওটা সূর্য রায়ের আসে না।

সুতরাং সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। "দাঁড়িয়ে যান। শুনুন একবারটি"—কোরাস উঠল দোকানের ভিতর থেকে।

সূর্য রায় একটু অবাক হয়ে ফিরে এলেন চৌকাঠের কাছে, আর সুফল 'ভুল হয়ে গিয়েছিল দাদা'—বলতে বলতে তাঁর হাতে তুলে দিল সাড়ে ছয় আনার খুচরো।

সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা ছট্টু হেঁকে উঠল—"এমন ভুলো মন নিয়ে আপনি লড়াই করতেন কী করে সূয্যিদা ?"

আজব কাণ্ড! প্রশ্নটি যাঁহাতক কানে যাওয়া, দারুণ চমকে উঠলেন সূয্যি রায়। সে-চমক এমনি চমক যে সুফলের হাত থেকে তক্ষুনি-পাওয়া রেজ্‌কিগুলো রায়ের হাত থেকে ঝন্ ঝন্ শব্দে ছড়িয়ে পড়ল ফুটপাতের পাথরে।

সুফল সেগুলো কুড়িয়ে তুলতে ব্যস্ত হল, আর ছেলেদের ক্রমাগত ডাকাডাকিতে রায়কে আবার গিয়ে বসতে হল টেবিলে। আর এক গেলাস চা ? না, অত পয়সা সূয্যি রায়ের নেই। পঞ্চু খাওয়াবে ? না, কারও পয়সায় সূয্যি রায় কখনো চা খান না। নিজের পয়সা যখন না থাকে—থাকে না অনেক সময়—তখন তিনি চা খান না, চায়ের দোকানেই আসেন না।

চা তিনি খাবেন না; তবে ছেলেরা জানতে চাইছে যখন, গল্পটা বলতে তাঁর আপত্তি নেই। বাজার ? সূয্যি রায় যা কলামুলো কিনবেন, তা বেলা বারোটাতেও বাজারে অমিল হয় না।

হ্যাঁ, বলতে তাঁর আপত্তি ত নেইই, বরং বলতে পেলে তিনি খুশী হন, মনটা হাল্‌কা বোধ করেন। অতীতের চিন্তায় মন সদাই গুমরে মরে, বুকের বোঝা মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বার করতে না পারলে—এক সময়ে বুকটা হয়ত ফেটেই যাবে একদিন।

চমকে উঠলেন কেন ? সূয্যি রায়ের মনে পড়ে গিয়েছে একটা কথা। অতীতে একদিন ঠিক ঐ প্রশ্নটিই—হুবহু ঐ কথাগুলিই প্রায়—সূয্যি রায়কে শুনতে হয়েছিল আর একজনের কাছে। সে এক বেদনার স্মৃতি! সে এক গৌরবের কাহিনী!

বলতে সুরু করলেন সূয্যি রায়।

কোহিমা থেকে ফিরছে তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ।

দখল করেও দখলে রাখতে পারা যায়নি কোহিমা। দুটো কারণ ছিল তার। পয়লা কারণ—ইংরেজের দুশমনি। না, না, দুশমন যে, সে ত দুশমনি করবেই। তাদের দোষ দিচ্ছি না! শুধু এইটুকু বলতে চাইছি যে তাদের হাতিয়ার আমরা ভোঁতা করে দিয়েছিলাম, এঁটে উঠতে পারিনি তাদের খবর চাপা দেওয়ার কারসাজির সাথে। মণিপুরে যারা লড়াই করছে, তারা যে জাপানী নয়, নেতাজীর বাহিনী, এতবড় খবরটা তারা বেমালুম চাপা দিতে পেরেছিল, বাহাদুরি বই কি! ঐ খবরটুকু কোনমতে ভারতে প্রকাশ পেলে কি আর রক্ষে ছিল ? আগুন জ্বলে উঠত সারা দেশে, পুড়ে যেত ইংরেজের সাধের মসনদ।

কিন্তু যা বলছিলাম—দুস্‌রা কারণ ছিল জাপানীর বেইমানি। ওদের সঙ্গে দোস্তি ছিল আমাদের, কিন্তু কাজ করল দুশমনের মত। রসদ যোগাবার ভার নিয়েছিল ওরাই, কিন্তু যোগাতে পারে নি এক দানা চাল বা এক টুকরো রুটি। আমাদের প্লেন ছিল না, রেঙ্গুন থেকে কোহিমায় রসদ যাবে কেমন করে ?

হটতে হল !

পিছু হটবার হুকুম দেওয়াই যখন স্থির করলেন নেতাজী, তাঁর তখনকার সে-মূর্তি এখনও মনে আছে আমার ! সোনার বরণ মুখখানিতে আঁধার নেমে এসেছে নৈরাশ্যের। কিন্তু চক্ষু দুটিতে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে যেন আগুন-পাহাড়ের বহ্নিশিখা।

জঙ্গলের পথে ফিরবার সময় আর আমি দেখিনি তাঁকে। দেখলাম রেঙ্গুনে পৌছে। তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন নিজের হেডকোয়ার্টারে।

খাসকামরায় নিরিবিলিতে কথা।

"মান্দালা সড়ক দিয়ে একখানি সাদা মোটর আসবে রাত দুপুরে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটায় থিবো-রাজার ভাঙা প্যাগোডার সমুখে দেখতে পাবে গাড়ীখানা। আরোহী থাকবেন এক ইউরোপীয় মহিলা। ইংরেজীতে কথা কইবে তাঁর সঙ্গে। তিনি দেবেন একতাড়া কাগজ। সেই কাগজের তাড়াটির ভিতর আমার জিওন-কাঠি মরণ-কাঠি। বুঝেছ ?"

আমি নীরবে স্যালিউট দিলাম শুধু।

তিনি বলে চললেন—"এই নীল রঙের আংটিটা রাখ। এইটি তাঁকে দেখালে তবে কাগজগুলি পাবে।"

আংটি হাতে নিয়ে স্যালিউট দিলাম আবার।

"থিবোর প্যাগোডার পাশ দিয়ে বনের দিকে চলে গিয়েছে ছোট রাস্তা। ঐ রাস্তায় দু'মাইল চলে যাবার পর একটা ছোট মসজিদ দেখতে পাবে, এর দেয়াল আছে, কিন্তু ছাদ নেই। ঢুকে পড়বে এর ভিতর। একখানা কোদাল দেখতে পাবে মেজেতে। ঈশান কোণে গর্ত করে কাগজগুলি তাতে রাখবে। গর্তটা গভীর হওয়া চাই।"

"আল্‌গা কাগজ মাটিতে নষ্ট হবে ত !"—দ্বিধার স্বরে আপত্তি জানালুম।

মাথা নেড়ে নেতাজী বললেন—"বলতে ভুলেছি। হয়ত বাধা আসবে তোমার সমুখে। আমার চারিদিকে শত্রুর চর। যাদের সাথে একই প্লেটের খাবার ভাগ করে খেয়েছি এতদিন, তাদেরই কেউ কেউ আজ জাপানের গোয়েন্দা হয়েছে। তারা হয়ত জানে ঐ ইউরোপীয় মহিলার কথা; তারা হয়ত চেষ্টা করবে ঐ কাগজগুলি হাতাবার জন্যে। তাই আমি ভেবেছি—এ রকম বিপদের কাজে তোমাকে একা পাঠাবো না। একজন সহকারী থাকবে তোমার। সেই সহকারীর হাত থেকে তুমি পাবে একটা লাল ইস্পাতের কৌটা। কাগজগুলি তাইতে পূরে কৌটাটি মাটিতে পুঁতবে।"

স্যালিউট দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"সহকারীটি—?"

"কে—তা এখনো বলতে পারি না; ষোলো আনা বিশ্বাস করতে পারি এমন কাউকে ত নাগালের ভিতর পাচ্ছি না—"

মুখে কথা যোগাল না। নেতাজীর সঙ্গেও কেউ বেইমানি করতে পারে, একথা স্বয়ং নেতাজীর মুখে না শুনলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

একটু থেমে তিনি বললেন—"যা-হ'ক, ভেবে দেখি, কাউকে একজন পাবই নিশ্চয়। রাত বারোটায় থিবো প্যাগোডার সমুখে সে মিলবে তোমার সাথে। তার হাতে থাকবে একটা চৌকো

লাল ইস্পাতের কৌটো, ঢাকনিওয়ালা। সে তোমায় সেইটে দেখাবে, তুমি তাকে দেখাবে ঐ নীল অঙ্গুরী—।”

স্যালিউট করে বিদায় নিলাম। মনটা মুষড়ে যাচ্ছে! নেতাজীর চারিদিকে ভীড় করে রয়েছে এত সব কর্নেল মেজর জেনারেল; এদের একজনও ষোল-আনা বিশ্বাসী নয়? নেতাজীর ভুল হয় না! নিশ্চয়ই ওরা জিওন-কাঠি মরণ-কাঠির সন্ধান পাবার যোগ্য নয়।

কিন্তু মুষড়ে-যাওয়া মনও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওরা কেউ যোগ্য নয় বটে, কিন্তু সুয্যি রায় যোগ্য। অন্য একজন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে অনেক ভাবতে হচ্ছে নেতাজীকে; কিন্তু সুয্যি রায়কে খুঁজে বার করতে হয় নি। বিশ্বাসী লোকের দরকার পড়তেই রায়ের কথা তার মনে পড়েছে, সকলের আগেই!

এ-আনন্দ কি রাখবার জায়গা আছে? এ-গৌরব কি এভারেস্টের চূড়ার চাইতে উঁচুতে উঠিয়ে দেয়নি সুয্যি রায়কে?

ঠিক রাত বারোটা যখন বাজবে, সুয্যি রায়কে হাজির থাকতে হবে থিবো-রাজার ভাঙা প্যাগোডার সামনে।

বিদ্যুৎ নেই! আমার সেই বিদ্যুৎ! আরবী ঘোড়ার রাজা! ঝড় যার পায়ে বাঁধা ছিল। কোহিমা থেকে ফিরবার পথে জঙ্গলের ভিতর শঙ্খচূড়ের কামড়ে প্রাণ হারিয়েছে বিদ্যুৎ! সুয্যি রায়ের অর্ধেক শক্তি সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে!

আমি চড়েছি এক অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়ায়; লম্বা চওড়া প্রায় হাতির মত; ছুটবার শক্তিও যথেষ্ট। কিন্তু তাই বলে বিদ্যুতের মত ত আর নয়। বিদ্যুতের মত হলে কোহিমার যুদ্ধের পর ওকে আমি ধরতেই বা পারব কেন? ওর আগেকার মালিক ছিল এক ইংরেজ কাপ্তেন; সে যুদ্ধে মারা যেতেই ঘোড়াটা এধার ওধার ছুটে বেড়াচ্ছিল পাহাড়তলিতে। আমি তখন বিদ্যুতের পিঠে সওয়ার; ওকে ধরতে একটুও কষ্ট হয়নি।

ঐ হাতির মত প্রকাণ্ড ঘোড়াটায় আমি চলেছি। রাত সাড়ে এগারটাতেই বেরিয়েছি ব্যারাক থেকে। যেতে কুড়ি মিনিট লাগবে; কারণ থিবোর প্যাগোডা শহর থেকে ঢের দূর। বারোটার কিছু আগেই পৌঁছানো দরকার; কারণ কে একজন সহকারী আসবার কথা রয়েছে; তার সঙ্গে পরিচয় করা, তার কাছে ইস্পাতের লাল কৌটো আছে কিনা—যাচাই করা ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু সময় ত কাটবেই।

তা হলেও যথেষ্ট সময় হাতে আছে; ধীরে চলছি। মাইল দুই দূরে আছি প্যাগোডা থেকে, হাতঘড়িতে সময় দেখলাম পৌনে বারো। একটু তাড়াতাড়ি করব ভাবছি, এমন সময় সমুখের মোড় ঘুরে ভুশ্ করে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা মোটর!

এবং মোটরখানা সাদা! চাঁদের আলো বেশ জোরালো ছিল; স্পষ্ট দেখতে পেলাম—মোটরখানা সাদা।

কত সাদা মোটর আজ রাতদুপুরে মান্দালা সড়কে চলছে হে? এটা ত আমাদের সেই ইউরোপীয় মহিলার মোটর নিশ্চয়ই নয়! সে মোটর ত রাত বারোটায় থিবোর প্যাগোডায় অপেক্ষা করবে! প্যাগোডার থেকে দুই মাইল পথ সে এগিয়ে পড়বে কেন? পৌনে বারোটার সময়?

হয় এ-মোটর অন্য কারও মোটর; নয় ত—

নয় ত গুরুতর ভুল কিছু ঘটেছে।

ভুল পৃথিবীতে ঘটে, তা স্থয্যি রায়ের অজানা নেই।

অতএব ?

অতএব—এক্ষেত্রে ভুল হয়েছে কিনা, সেটা নিশ্চিত না জেনে মোটরকে কেমন করে পাশ কাটিয়ে যেতে দেওয়া যায় ?

আমি পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম ইংরেজীতে—"থামুন! থামুন শীগগির তা নইলে গুলি করে টায়ার ফাটিয়ে দেব।"

আমার জীবন তখন এক গাছা স্থতোর উপর ঝুলছে! গাড়ি যদি সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক না কষে, আমি সরে গিয়ে গুলি করবার সময়ই পাব না, গাড়ির তলায় ঘোড়াসমেত চাপা পড়ব নিশ্চয় !

কিন্তু ব্রেক কষল। আমি এগিয়ে গিয়ে বিনতভাবে বললাম—"আমি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক। একটি নীল আংটি নিয়ে—"

"সে কি কথা ? আপনিও ?"—নারীকণ্ঠ শুনতে পেলাম গাড়ীর ভিতর থেকে। মহিলাটি যে চমকে গিয়েছেন, রীতিমত অবাক হয়েছেন, ভয়ও পেয়েছেন একটু—তা ঐ দু'টি কথা থেকেই বোঝা গেল পরিষ্কার।

"আপনার কথার ভাবে বুঝছি—নীল আংটি নিয়ে অপর কেউ আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করেছে।" ভয়ে ভয়ে বললাম আমি।

"করেছে বই কি! সেও আজাদ হিন্দের সেনানী, সেও নীল আংটি দেখিয়ে—অবশ্য রাত বারোটা তখনো বাজেনি; তবু আমিও যখন এসে পড়েছি, সেও যখন এসে পড়েছে, বিশেষতঃ আমায় রাত কাটাতে হবে রেঙ্গুনের হোটেলে; যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, ততই ভালো!" তড়বড় করে কৈফিয়ৎ কাটতে লাগলেন মহিলাটি। হায়! কৈফিয়তে যদি ভুলের গলদ শোধরাত, তাহ'লে ভাবনা ছিল কী ?

"আমি কি বুঝব যে কাগজগুলি আপনি সেই অপর সেনানীকে দিয়ে ফেলেছেন ?"—আমার কথায় এমন ভয় আর নৈরাশ্য ফুটে উঠল যে মহিলার কথার ভিতরেও এবার ভয়ের স্থর শুনতে পাওয়া গেল।

"তা—তা—তার হাতে যে নীল আংটি ছিল! নেতাজী জানিয়েছিলেন—তাঁর নাম-লেখা নীল আংটি যে দেখাবে—"

"ঠিক ত! নাম-লেখা আংটি! আপনি যে আংটি দেখেছিলেন, তাতে কি নাম লেখা ছিল নেতাজীর ?"

"নাম ? ছিল বই কি! অর্থাৎ ? ইংরেজীতে নয়, অন্য কোন ভাষায়—আমি সে ভাষা পড়তে পারিনি—সৈনিকটি বলেছিল, ওটা বাংলা লেখা! নেতাজী ত ব'লে দেন নি যে কী-ভাষায় তাঁর নাম আংটিতে লেখা থাকবে!"

"কিন্তু আপনি যখন বাংলা পড়তে পারেন না। তখন কী করে বুঝলেন যে নেতাজীর নামটিই ও আংটিতে খেলা ছিল! অন্য কারও নামও ত হ'তে পারে!"

মহিলাটি কাতর হয়ে বলে উঠলেন—"ভগবান আমায় রক্ষা করুন!"

আমি কঠিন স্বরে বললাম—"আপনাকে ভগবান রক্ষা করবেন কি না, জানি না। তবে নেতাজীর রক্ষা পাওয়ার আশা যে কম, তা আমি জানি।"

ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম গাড়ির ভিতর থেকে।

তিক্তস্বরে বললাম—"কেঁদে লাভ নেই। লোকটা গেল কোন্ দিকে, লক্ষ্য করেছেন কি?"

"না ত!"—কিন্তু-ভাবে মহিলা বললেন—"তা ত লক্ষ্য করিনি! আমি যখন গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম, তখনও সে দাঁড়িয়েই ছিল কি না! পিছন ফিরে আর লক্ষ্য করিনি!"

"বেশ! তবে আর কী! হোটেলে গিয়ে ঘুমোন! আশা করি আরামেই রাত কাটবে!"

নমস্কার জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম প্যাগোডার দিকে। গাড়ী চলার শব্দ যখন কানে এল, তখনও ফিরে চাইলাম না পিছন দিকে। আমার ঘোড়া চলেছে তীর বেগে, মন ছুটেছে তারও চেয়ে দ্রুতবেগে।

কে সেই বেইমান? কোথায় গেল সে? কার কাছে নিয়ে যাবে সেই কাগজগুলি, যা নেতাজীর জীওন-কাঠি মরণ-কাঠি? জাপানীরা আর আমাদের বন্ধু নেই, কোহিমার বেইমানিতেই তার পরিচয় মিলেছে। হেডকোয়ার্টারে কানাঘুষা শুনেছি—তলে তলে জাপান সরকার সন্ধি করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। নেতাজী কিন্তু প্রাণ থাকতে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করবেন না। কাজেই বিরোধ ঘটবেই। মনে মনে অবিশ্বাস যতই থাক, মুখের সদ্ভাব এখনো আছে। সেটা আর বেশীদিন থাকবে না।

এসব জনরবে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তবে এটাই সম্ভব যে আমার সহকারী জাপানীদের ফুসলানিতেই কাগজগুলি ঠকিয়ে নিয়েছে। আর, তাই যদি নিয়ে থাকে, তবে ত তার গতি হবে এখন জাপানী শিবিরের দিকে!

গিবোর প্যাগোডা ছাড়িয়ে আরও মাইল দশেকের মাথায় জাপানীদের ছাউনি আছে একটা! কালাং পাহাড়ে!

পিছনে স্থয্যি রায় রয়েছে। স্নুতরাং বেইমান রেঙ্গুনে ফিরবার চেষ্টা করবে না। সে ছুটবে কালাং পাহাড়ের ছাউনিতে।

যা ভেবেছি, তাই। প্যাগোডার আশেপাশে জনপ্রাণী নেই! খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করলাম না আর। সোজা রাস্তা ধরে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম কালাং ছাউনির পানে। নিশ্চয়ই আমার বেইমান বন্ধু এই পথ ধরেই ছুটে চলেছে আমার আগে আগে! মিনিট দশেকের রাস্তা সে এগিয়ে আছে বটে! হায়, আজ যদি আমার বিদ্যুৎ থাকত! এই অস্ট্রেলিয়ান হাতি কি ওর নাগাল ধরতে পারবে?

পারুক না পারুক, ছুটছে ঘোড়াটা! স্থয্যি রায় যখন ঘোড়াকে ছোটাতে চায়, তখন সে মরতে মরতেও ছুটতে বাধ্য হয়। কথা হল এই যে কতক্ষণ ও এইভাবে ছুটতে পারবে! হাঁপিয়ে যাবে না ত?

বেশীক্ষণ ছুটবার আগেই থামতে হল। পথ রুখে দাঁড়াল এক সৈনিক। নিঃসন্দেহ জাপানী। বলা নেই, কওয়া নেই—গুলি করল আচমকা। আমি তীরবেগে ছুটেছিলাম বলে সে তাক ঠিক করতে পারে নি, লাগল না গুলি। আবার ফায়ার করবার আগেই আমি গিয়ে তার উপরে পড়লাম। তারপর? স্থয্যি রায়ের তরোয়ালের সমুখে এক মিনিট টিকতে পারে, এমন সৈনিক সেদিন এসিয়াতে বেশী ছিল না।

ওকে খতম করে ওর কাপড় চোপড়গুলো পরীক্ষা করলাম। কী জানি, কাগজগুলো যদি ওর কাছেই থাকে! না! নেই!

ওর ঘোড়াটা আমার ঘোড়ার চাইতেও অধম। কাজেই ওর দিকে আর নজর দিলাম না। আমার হাতী নিয়েই ছুটলাম আবার।

আরও খানিকটা গেলাম। তারপর আবার বাধা। এ আবার আর এক জাপানী। বার বার হয়ত গুলি ফসকাবে না। আমি ঘোড়াটাকে আড়ভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম তার আড়ালে— সেই মুহূর্তেই গুলি করল শত্রু। আমার অস্ট্রেলিয়ান বেচারীর গলায় বিঁধল গুলি। সে প'ড়ে যাবার আগেই আমার গুলি গিয়ে বিঁধল শত্রুর কপালে। সে উলটে পড়ল।

এর দেহ তল্লাসী করবার আগে এর ঘোড়াটা ধরে ফেললাম। কাগজগুলি উড়ে পালাচ্ছে না, কিন্তু ঘোড়া দৌড়ে পালাবে। অথচ আমার অবস্থা তৃতীয় রিচার্ডের মত এখন ; রাজ্য আমার নেই, থাকলে একটা ঘোড়ার বিনিময়ে অনায়াসে তা দিতে পারি।

যা ভেবেছিলাম, কাগজ এর কাছেও নেই।

ছুট! ছুট! আবার ছুট! কাগজ আছে সেই বেইমান লোকটার কাছে, নেতাজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা যে করেছে। তার কাছে পৌঁছোবার আগে আরও কয়টা জাপানীর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হবে আমায়, কে জানে! কালাং ঘাঁটিও বেশী দূর নয় আর! মিনিট দশেকের ভিতর ওকে ধরতে না পারলে আর পারব না। সর্বনাশ হয়ে যাবে! নেতাজীর জিওন-কাঠি মরণ-কাঠি চলে যাবে শত্রুর খপ্পরে! আমার অবশ্য দোষ কেউ দিতে পারবে না, কিন্তু "তোমার দোষ নেই" বললেই খুশী হয়ে যারা সরে আসতে পারে, সূর্য্যি রায় তাদের দলের নয়।

ছুট! ছুট! ভাগ্য ভাল, এই প'ড়ে পাওয়া ঘোড়াটা আমার হাতীর চাইতে-ভাল জন্তু! ছিমছাম সরু গঠন। অনেকটা আমার বিদ্যুতের মত! সে আমায় উড়িয়ে নিয়ে চলল পলাতকের পিছনে।

ঐ যে! ঐ যে দেখা যায়!

চাঁদের আলোতে দূর থেকে দেখেও বুঝতে পারা গেল—এবং পোশাক আজাদ হিন্দের ইউনিফর্মের মতই! অর্থাৎ, বেইমান আমার সমুখেই!

আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেছে লোকটা। যথাশক্তি সে ত ছুটছিলই, তার চাইতেও বেশী জোরে সে ছুটবার চেষ্টা করতে লাগল। সূর্য্যি রায় তার পিছনে, প্রাণের দায়ে সে ঘোড়া ছোটাল।

হঠাৎ দেখি, তার মাথার টুপিটা উড়ে মাঠের ভিতর পড়ে গেল। আশ্চর্য ত! আমাদের টুপিগুলি ত' হাল্‌কা নয় যে হাওয়ায় উড়ে যাবে! ছুটতে ছুটতে হয়ত মাথা গরম হয়ে গেছে লোকটার। ইচ্ছে করেই হয়ত ছুঁড়ে দিয়েছে।

যাক, ওটা একটা ভাববার মত কথা নয়।

ওর ঘোড়াটা হোঁচট খেল! প'ড়ে যায়-যায়, আরোহী লাফ দিয়ে নামল তার পিঠ থেকে। এইবার?

গুড়্ গড়্!

যাকে দেখলাম, তাকে বেইমানের ভূমিকায় দেখবার কল্পনা করতে পারি নি কোনদিন। তার নাম করব না ; কারণ সে এখনো বেঁচে আছে, দেশের গণ্যমান্য পদস্থ লোক সে। আমার অন্তরঙ্গ

বন্ধু ছিল সে ; তাই তাকে প্রাণে মারি নি আমি। শুনে তিনটে লাথি মেরেছিলাম তার মুখে আর তারই ঘোড়ার লাগাম তরোয়াল দিয়ে কেটে নিয়ে তাই দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে তাকে ফেলে এসেছিলাম পথের উপর।

কিন্তু কাগজ? তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করলাম তাকে এবং তার ঘোড়াকে। নেই, কাগজ নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর দিল না বেইমান।

হঠাৎ আমার মাথার ভিতর তড়িৎ খেলে গেল। টুপী? টুপী সে ছুঁড়ে মেরেছিল না? কাগজ ঐ টুপীর ভিতর আছে! নিশ্চয় আছে! লড়াইয়ে যদি প্রাণটা বেঁচে যায় কোন মতে, আমার হাত ছাড়াবার পর টুপীটা কুড়িয়ে আনবে আবার, এই ছিল মতলব।

ওকে ফেলে রেখে পিছন পানে ছুটলাম আবার। টুপী খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। ঠিক আছে! টুপীটারই ভিতর কায়দা করে আট্‌কানো আছে কাগজের বাণ্ডিল।

বলতে ভুলেছি, বেইমানকে তল্লাসী করবার সময় তার পকেটে পেয়েছিলাম লাল রংয়ের একটা ইস্পাতের কৌটো, নেতাজী যার কথা বলেছিলেন। সেটা আমি ফেলে আসিনি।

কাগজ নিয়ে ফিরে এলাম থিবোর প্যাগোডায়। খুঁজতে লাগলাম তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা কোথায় আছে। পেলাম সে রাস্তা। রাস্তা তাকে বলা যায় না, পায়ে-চলা সুঁড়ি পথ একটা। দুপাশের আগাছার ডালপাতা ঘোড়ার গায়ে পড়ে ঘন ঘন। ভয় হয়—এই বুঝি সাপে ছোবল মারে গাছ থেকে। ঠিক এই মুহূর্তে আমি মরতে রাজী নই; নেতাজীর কাজটা আগে সেরে নিতে চাই।

ছাদবিহীন মসজিদে গিয়ে কোদাল পেলাম। ঈশান কোণে গভীর গর্ত করে উঠে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলছি; এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ব'লে উঠল—"কাগজগুলো দেখি একবার!"......

চমকে তরোয়ালে হাত দিতে গিয়ে, সেই হাত কপালে তুলে স্যালিউট দিলাম। সম্মুখে নেতাজী—!

কাগজগুলি এক পলকের জন্যে উল্‌টে পালটে দেখলেন—টর্চের আলোতে। তারপর বললেন—"ঠিক আছে! কৌটোয় পূরে গর্তে চাপা দাও।"

আমি মাটি চাপা দিচ্ছি, তিনি নিজে থেকেই দু'চারটে কথা জানালেন আমাকে। "ইউরোপীয় মহিলাটি হোটেলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন নি—যেমনটা তুমি উপদেশ দিয়েছিলে। নিজের জীবনের ও সুনামের আশঙ্কা সত্ত্বেও আমাকে খবর দিয়েছিলেন যে কাগজ চুরি গিয়েছে। শুনে আমি নিজে বেরিয়ে পড়েছি; কারণ বিশ্বাসী লোক ত' আমার হাতে এখন একটির বেশী দু'টি নেই! বেরিয়ে এসে তোমার হাতযশের প্রথম নমুনা দেখতে পেলাম—কালাং ছাউনির পথে। জাপানী একজন মরে পড়ে আছে রাস্তায়। সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখতে পেলাম কালাংয়ের দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কে আসছে। রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলাম। দেখলাম যে সে তুমি। তারপর আর কি! তোমার বেশ খানিকটা পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম সোজা এখানে।"

আমার কাজ শেষ হল। তিনি এক-পা এগিয়ে এসে আমার কাঁধে—বাঁ-কাঁধের ঠিক এই জায়গাতে তাঁর হাতখানি রেখে বললেন—"আমি আর বেশী দিন রেঙ্গুনে থাকব না এটা ঠিক। যে-কয়দিনই থাকি, কাগজগুলো নিজের কাছে রাখা নিরাপদ হবে না জেনে এইখানে লুকিয়ে রাখলাম।

যাবার আগে আমি নিজে এসে তুলে নিয়ে যাব ; যতদিন আমি না যাচ্ছি, ঐ কাগজগুলির কথা তুমি এই মুহূর্ত থেকে বেমালুম ভুলে থাকবে—এই হল তোমার নেতাজীর অনুরোধ ও আদেশ !"

আমি নীরবে স্যালিউট দিলাম। তারপর কোদালখানা তুলে নিলাম কাঁধে। তিনি মাথা নেড়ে বললেন—"ঠিক ! ওটা এখানে থাকার দরকার নেই, নিয়ে চল।"

দু'জনে বেরিয়ে এলাম। ঘোড়া দু'টি বাঁধা ছিল যেখানে, সেখানে এসে দাঁড়ালাম। ঘোড়ার রেকাবিতে পা তুলে দিয়ে হঠাৎ তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু ওটা সত্যিই ঈশান কোণ ত ?"

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি নি—এমনিভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম—"কোন্‌টা ?"

"আরে যেখানটায় কাগজগুলো রাখা হল !"

আমি ততোধিক হতভম্বের মত তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললাম—"কাগজগুলো ? কোন্ কাগজগুলো নেতাজী ?"

নেতাজী রেগে উঠলেন। আর ঐ প্রশ্নটি—ছোট মজুন্দার একটু আগে যে-প্রশ্ন করে আমায় চমকে দিয়েছিল—হুবহু প্রায় ঐ কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরুলো আগুনের হলকার মত—

"এমন ভুলো মন নিয়ে তুমি লড়াই কর কী করে সূয্যি রায় ?......"

কিন্তু আমায় আর এ প্রশ্নের জবাব দিতে হল না। নেতাজীর মনে পড়ে গেল তাঁর নিজেরই এক মুহূর্ত আগের আদেশ ও অনুরোধ ! চোখে মুখে অপরূপ হাসি ফুটে উঠল তাঁর। হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধের উপর আদরের চাপড় মারলেন কয়েকটি। তারপরই ঘোড়ায় উঠে ছুটলেন রেঙ্গুনের পানে।

আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। মনে হল যার পিঠে আমি সওয়ার হয়ে চলেছি—সে ঘোড়া নয়, সে ঝড়ো হাওয়া !

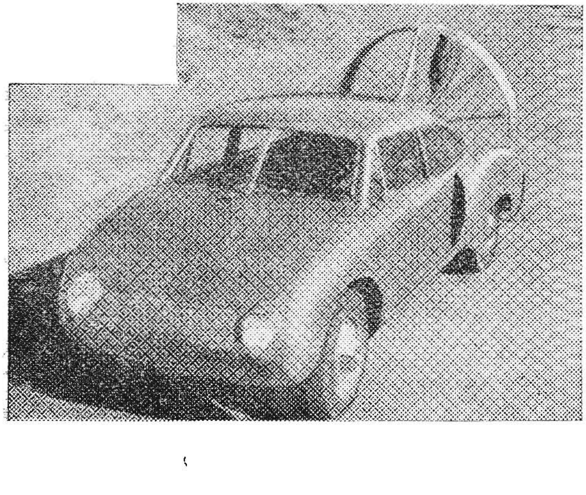

● জেনে রাখা ভালো

এরোপ্লেন পাখার সাহায্যে উড়ে—এই গাড়িটি পাখার সাহায্যে চলে। গাড়ির পেছনে রাখা মেসিন পেছনের পাখাটিকে ঘোরায়, আর তার ফলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি হয়ে গাড়িটিকে সামনে টেনে নিয়ে চলে। আমেরিকার আর্জেন্টিনায় গাড়িটি নির্মিত হয়েছে। গাড়িটির গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬৫ মাইল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

পাতালগুহার কথা

—নীরদচন্দ্র মজুমদার

মানুষের একটা আশ্রয় চাই। তাই, যার যেমন শক্তি—সে তেমনি ঘরবাড়ি তৈরী করে। কেউ জমকালো প্রাসাদ গ'ড়ে তোলে, কেউ বাঁধে পাতার কুঁড়ে বা রচনা করে বরফের ঘুমটি।

কিন্তু এমন একদিন ছিল—যখন এসব কিছুই গ'ড়ে নেবার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। সেই আদি-যুগের কথা বলছি। তখন মানুষের বুদ্ধিও ছিল সামান্য। হাতিয়ার যন্ত্রপাতিরও ছিল অভাব। তাই তারা বাস করত গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায়। গুহা পেলে আর কোটরে যেত না। কারণ আরাম ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে গুহার সঙ্গে কোটরের তুলনাই হয় না।

বাস করত পাহাড়ের গুহায়

কাজেই, আদিম মানুষের একটা বড় কাজ ছিল গুহা খুঁজে বেড়ানো। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক গুহা তারা দেখতে পেত; তার ভিতরে ঢুকলে তাক্ লেগে যেত অনেক সময়ে। বাইরের গুহাটা দরজা মাত্র, ভিতরে একটার পিছনে আর-একটা, তারও পিছনে আরও একটা—সারি সারি অগুনতি চ'লে গিয়েছে গুহার শ্রেণী। ঠিক যেন একটা মাটির তলার নতুন দেশ অপেক্ষা ক'রে আছে আশ্রয়হারা অভাগা মানুষকে বুকের নীড়ে ঠাঁই দেবার জন্যে। ঠাঁই সেখানে নিত সে-যুগের মানুষ, মাটির তলায় গেরস্তালি পেতে জাঁকিয়ে তুলত পৃথিবীর প্রাচীনতম উপনিবেশ।

এই যে উপরে পাথর, নীচে পাথর, চার দেয়ালে পাথর দিয়ে ঘেরা রহস্যময় গুহার দেশ—আলো যেখানে ঢোকে না, হাওয়া যেখানে ঢুকতে পায় অনেক কৌশলে—এদেশের সৃষ্টি হল কেমন ক'রে?' এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অবশেষে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন—মাটির তলায় যে জলধারা আছে, তারই গতিবেগে এদের উৎপত্তি।

জলের ধর্মই হচ্ছে, তা' নীচুপানে চলে। যেখানে পথ নেই, সেখানেও নতুন পথ ক'রে নিয়ে এগিয়ে চলে। চলার পথে মাটি থেকে সংগ্রহ করে নেয় কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস। এটা আসে পচা শুক্‌নো প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের গুঁড়ো-গাড়া থেকে। মরা পাতা, ভাঙ্গা ডাল—এসবই ঐ গ্যাসটার জন্মদাতা।

জলের সঙ্গে কার্বন ডায়ক্সাইড মিশে তৈরী করে কার্বনিক অ্যাসিড; আর সেই অ্যাসিডের স্পর্শে কয়েক রকমের পাথর গ'লে জল হয়ে বেরিয়ে যায় জলস্রোতের সঙ্গে। এই সব পাথরের ভিতর চুনা পাথরের সাথেই আমাদের বেশী পরিচয়; চুনা পাথরের পাহাড়েই দেখতে পাওয়া যায় অধিকাংশ বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ গুহা।

জলের বেগে গুহার সৃষ্টি ত' হল! কিন্তু জল কি সেখানে চিরদিনই রয়ে যাবে? না, তা' নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই আছে। জলধারা হয় ত' শুকিয়ে যাবে, নয় যাবে অন্য পথে মোড় ঘুরে। জলহীন গুহা পরিণত হবে মানুষের বাসস্থানে। অথবা ধাতব পদার্থের ক্রিয়ায় বটের ঝুরির মত শ্বেত পাথরের ঝুরি নামবে তার ছাদ থেকে, আর সুঁদরি গাছের শূলোর মত শ্বেত পাথরের শূলো গজিয়ে উঠবে গুহাতল বিদীর্ণ ক'রে। স্বভাবশোভার এক অতুলনীয় নিদর্শন হয়ে চিরযুগ বিরাজ করবে পাহাড়ের আঁধার উদরে।

আল্পস পর্বতের অ্যাডেল্‌স্‌বার্গ গুহা প্রসিদ্ধ। ছাদ থেকে নেমে-আসা পাথর-ঝুরির জন্যেও বটে, নীচের গর্জনশীল জলস্রোতের জন্যেও বটে। এ-অঞ্চলটাই অদ্ভুত। যেখানে সেখানে মাটিতে গর্ত, আর তলায় ঘূর্ণির আকারে আস্ফালন করছে পাতাল-নদীর জলতরঙ্গ। মাটির নীচে এখানে অগুনতি গুহা, অসংখ্য নদী! অতল গহ্বর যে কত, তার লেখাজোখা নেই। দু'শো গজ চওড়া একটা পাথরের গুম্বজ আছে এখানে; তার তলা দিয়ে এক সময়ে পয়েক নদীর গতিপথ ছিল মনে হয়। এই গুম্বজের ছাদ থেকে কত যে বিশালকায় পাথর-ঝুরি নেমেছে, কে তা' গুনে শেষ করবে?

এই গুহাগুলি শুধু যে শোভার দিক থেকে দর্শনীয়, তা' নয়। প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান যোগানোর দিক থেকেও এদের অনেক অবদান। অনেক গুহার নীচে সিংহ, ভল্লুক, ম্যামথ ও হরিণের দাঁত ও হাড় পাওয়া গিয়েছে; কোন কোন গুহাতে আবার মনুষ্যবাসের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের মেন্‌ডিপ্‌ পাহাড়ে আছে উকীহোল নামে গুহা, তার মেজেতে পাওয়া গিয়েছে তীরের ফলা, পাথরের অস্ত্র,—আরও কত কী। কতকগুলি গুহাতে আদিম মানুষ দেয়ালে এঁকে গিয়েছে বিবিধ পশুর বিচিত্র ভঙ্গীর ছবি। আবার কোন কোন দেয়ালে এঁকে রেখেছে প্রাচীন মানুষের শিকারের দৃশ্য।

কেন্‌টকির ম্যামথ গুহা "ম্যামথ" নাম পেয়েছে তার বিশাল বিস্তারের জন্যে। এটা একটা আলাদা পৃথিবী বললেই হয়। এর ভিতর হ্রদ আছে, নদী আছে, পথ আছে, চত্বর আছে, ক্রমশঃ ঢালু হতে হতে একেবারে অতলে গিয়ে নেমেছে এই গুহার রাজ্য। এ-রাজ্যের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ দেড় শো মাইল, চলাচলের পথগুলির উচ্চতা কোনখানেই সাত ফুটের কম নয়। হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে—কার্বনিক অ্যাসিড মেশানো জলের বেগে যে-পরিমাণ পাথর গ'লে যাওয়ার ফলে এই গুহা-রাজ্যের সৃষ্টি হতে পেরেছিল, তা' এক কোটি কুড়ি লক্ষ কিউ-বিক গজের কম নয়।

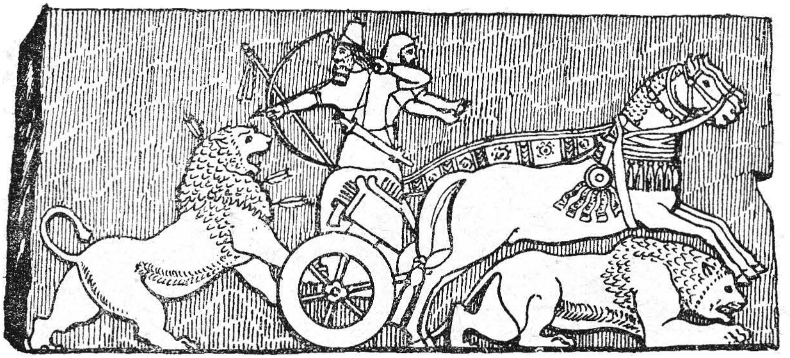

প্রাচীন মানুষের শিকারের দৃশ্য [পৃঃ ৩৭

এই ম্যামথ গুহায় আবার প্রাণীও বাস করে। কয়েক রকম ছোট মাছ আছে—আর কয়েক রকম ফড়িং। তারা সবাই অন্ধ! যুগ যুগ ধ'রে বংশ পরম্পরায় আলোকের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত আছে ব'লে এরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে! কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্র শক্তিশালী, এদের ধরা-ছোঁয়া অসম্ভব বললেই হয়।

নিউ মেক্সিকোর কার্লস্‌বাদ গুহাগুলিও আকারে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। দৈর্ঘ্য এদের অনেক মাইল।

সমুদ্রজলের আক্রমণে পাহাড়ের অভ্যন্তর ক্ষয়ে গিয়ে গুহার সৃষ্টি করেছে, এমনও দেখা যায় অনেক জায়গায়।

বিশাল পৃথিবীর কোথাও কোথাও চোখে পড়ে একটা বিস্ময়কর জিনিস—প্রাকৃতিক-সেতু। দুই দিক থেকে পাথরের দেওয়াল এসে গুম্বজের আকারে মাঝপথে মিশে গিয়েছে, রচনা করেছে পাথরের পুল। অনুমান হয়—এগুলিও অতীত যুগের গুহার ধ্বংসাবশেষ। গুহার ছাদের একটা অংশ টিকে আছে, বাকি সব গেছে ভেঙে ধুলোয় মিশে।

আনন্দ-উছল সুইটজারল্যাণ্ড

—শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

জুরিকের পথে

বেরিয়েছিলাম য়ুরোপ ভ্রমণে। কিন্তু সত্য কথা বলতে হলে, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সুইটজারল্যাণ্ড দেশটা দেখা। সুইটজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্যের খ্যাতি জগৎজোড়া। দেখতে হবে কেমন সে দেশ, যা' সকলের মন হরণ করে, যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পর্যটকমাত্রেই শতমুখ, যুগে যুগে যা' কবিকে দেয় কাব্যরচনায় প্রেরণা।

সন্দেহ ছিল কি জানি অপরের রুচির সঙ্গে আমার রুচি হয়তো নাও মিলতে পারে; আমার মনকে সুইটজারল্যাণ্ড তেমনভাবে মুগ্ধ নাও করতে পারে।

বন্ধু বললেন,—বেশ তো, মিউনিক দেখা তো হোলো, এবার চল, কালই আমরা জুরিক চলে যাই সুইটজারল্যাণ্ড সত্যই 'সুইট' কিনা যাচাই করার চেষ্টা করা যাবে।

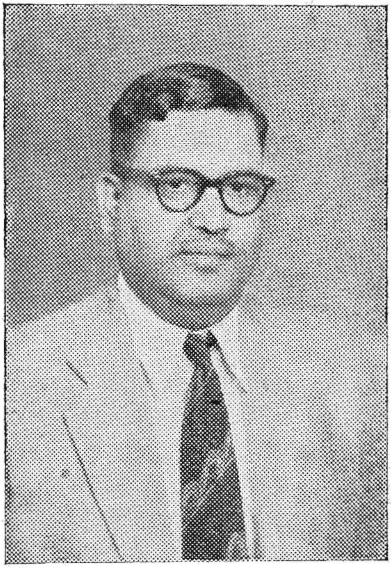

লেখক শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

জুন মাসের তখন সবে শুরু। রোদের তেমন জোর নেই; মুমূর্ষু রোগীর চোখের মতন আকাশটা সেদিন কেমন যেন ঘোলাটে। মিউনিকের হোটেল থেকে ট্যাক্সি করে 'বানহফে' গিয়ে নামলাম বেলা প্রায় দেড়টায়। রেলস্টেশনকে জার্মান ভাষায় বলে 'বানহফ'।

ট্রেন ছাড়তে তখনও আধঘণ্টা দেরী। সঙ্গে ছিল কিছু মালপত্তর। আমাদের দেশীয় প্রথামতে দু'জনের পক্ষে তা' এমন কিছুই বেশী নয়; তিনটে বড় সুটকেস, একটা কিটব্যাগ, আর দুটো লাস্ট-মিনিট ব্যাগ। এ ছাড়াও বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতন আমাদের দু'জনের হাতে দুই ওভার-কোট আর দুটি ক্যামেরা। তবু তো আত্মীয় পরিজনের শত উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও সঙ্গে নেওয়া হয়নি আরও অনেক কিছু; যেমন, বিছানার দুই প্রকাণ্ড গাঁটরি, একটা ইকমিক কুকার, এক টুকরি ফল ইত্যাদি, যেমন আমরা এদেশে কোথাও বেড়াতে গেলে সচরাচর সঙ্গে নিয়ে থাকি।

য়ুরোপের টুরিস্টরা কিন্তু এরকম গন্ধমাদন নিয়ে ঘোরে না। একটা ব্যাগ কিংবা খুব জোর একটা সুটকেসই একজনের পক্ষে যথেষ্ট। পাহাড়প্রমাণ মালপত্র ট্রেনের কামরার মধ্যে সঙ্গে নেওয়ার কোন ব্যবস্থাও নেই; কারণ সেটা কেবল নীতিবিরুদ্ধ তাই নয়, আইনবিরুদ্ধও। যাত্রীদের মাথার ওপর জাল দেওয়া একটুখানি জায়গা আছে; সেখানে বড় জোর একটা মাঝারি সাইজের সুটকেস রাখা

চলতে পারে। মাল বেশী থাকলে সঙ্গে না নিয়ে লাগেজে দেওয়াই প্রশস্ত। গাড়ি-ভর্তি লোকের অসুবিধা করে নিজের সুবিধাটুকু যেন তেন প্রকারেণ করে নেবো এরকম সংকীর্ণ ও স্বার্থপর মনোবৃত্তির পরিচয় ওদেশে বিরল।

প্ল্যাটফরমে গাড়ি এলো মিনিট পাঁচেক মাত্র থাকতে। ভিড় এমন কিছু নয়। টিকিট অগ্রিম কেনা ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির। দু' শ্রেণীর গাড়ির প্রচলন এখানে,—প্রথম আর তৃতীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীও ছিল, সম্প্রতি উঠে গেছে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর গাড়ির মধ্যেও আবার শ্রেণী বিভাগ আছে; ধূমপায়ী যাত্রীদের জন্যে একশ্রেণী, আর যাঁরা ধূমপান করেন না, তাঁদের জন্যে অপর শ্রেণী। আমরা ধূমপায়ী নয়; সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়িতে জার্মান ভাষায় Nichtraucher (ধূমপান নিষেধ) লেখা আছে তাইতে উঠে পড়লাম।

তৃতীয় শ্রেণীর হলেও গাড়ির ভেতরটা এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে না দেখলে এ দেশের কোন লোকের পক্ষে ধারণা করাই শক্ত। তোমরা হয় তো ভাবছ, এত পরিষ্কার থাকা সম্ভব হয় কি করে? ওদেশের লোকের মনে কিন্তু এ রকম কোন প্রশ্নই জাগে না। যে গাড়িতে নিজেরাই যাতায়াত করব, সে গাড়িতে চিনাবাদামের খোলা, কমলালেবু বা আকের ছিবড়ে ফেলব, জানলার কাচ ভেঙে দেব, গাড়ির দেওয়ালে যা তা লিখে বা ছবি এঁকে নোংরা করব,—এটা কি করে সম্ভব হয়, ও দেশের লোকের কাছে সেইটাই হোলো প্রশ্ন। গাছের যে ডালে ওরা বসে, সে ডাল নিজের হাতে কাটে না, অথবা নিজের পায়ে নিজে কুড়ুলও মারে না। এটুকু সাধারণ বুদ্ধি ও প্রকৃত নাগরিকের যোগ্য দায়িত্ববোধ না থাকলে গাড়ির ভেতর এমন উন্নত ধরনের সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া কোনমতেই চলত না।

শুনলে তোমরা অবাক হবে, গাড়ি তৃতীয় শ্রেণীর হলেও, সিটগুলি কিন্তু সোফার মতন দিব্বি পুরু গদি-আঁটা। দূরপাল্লার যে কোন ট্রেনের সিটেই সাধারণতঃ গদি থাকে এই রকম। দুটি দুটি করে চারটি সিট নিয়ে ভাগ করা আছে, একটি আলাদা কামরার মতন। মাঝখানে কাচের চতুষ্কোণ জানলাটি বেশ বড়; বাহিরের দৃশ্য দেখার ভারী সুবিধে। জানলায় আবার পর্দারও ব্যবস্থা আছে। আর তার ঠিক নীচেই ফিট করা আছে, ছোট একটি টেবিল। প্রয়োজন হলে এর ওপর আহার্য দ্রব্য রেখে খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে। মালপত্তর যথাস্থানে রাখা হলে জানলার ধারে মুখোমুখি দু'টি সিটে দু'জনে বেশ আরাম করে বসা গেল। ওভারকোট দুটিকে ঝুলিয়ে দিলাম মাথার কাছে জানলার পাশের দুই হুকে।

স্টেশনের পর স্টেশন ছাড়িয়ে গাড়ি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পেছনে-ফেলে-আসা দেশগুলির স্মৃতি মনের মধ্যে জমে উঠছিল। আর আকাশেও জমে উঠছিল মেঘ।

একটি বেশ বড় স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। স্টেশনের নাম লেখা আছে 'কেম্পটেন' (Kempten)। ভাবলাম এ সব দেশে ভাষা বিভ্রাটের জন্যে আমাদের মতন প্রাচ্য দেশের লোকদের যথেষ্ট ভুগতে হয় বটে, কিন্তু তা' হলেও লেখাটা রোমান হরফে চলে তাই রক্ষে। না হলে স্টেশনের নাম, রাস্তার নাম, হোটেলের নাম কিছুই তো বুঝতে পারতাম না। ভাগ্যে ইংরেজি ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ নই; তা' হলে কি বিপদই যে হোতো!

কেম্পটেন স্টেশন ছেড়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তখন। 'ইমেনসটাড্' (Immenstadt) স্টেশন ছাড়াতেই আরম্ভ হোলো তুষারপাত। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব সাদায় সাদা। লাইনের ধারে বর্ষণ-অভিষিক্ত মাঠের ওপর কে যেন সাদা ধবধবে চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। কি যে সুন্দর লাগল!

যত এগিয়ে চলেছি, তুষারের আবরণ ততই আরও ঘন হয়ে উঠছে। 'ওবারস্টাউফেন' (Oberstaufen) স্টেশন অতিক্রম করার পর বর্ষণ থামল বটে, কিন্তু তুষারের আবরণ তখন আরও জমাট ও মসৃণ হয়ে উঠেছে। বন্ধ কাঁচের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখছি পথপ্রান্তর, ক্ষেত খামার, বাড়ির টালির ছাদ সব পুরু বরফে সাদা। পাইন গাছের ওপর এমন ঘন হয়ে বরফ জমেছে যে তার পত্রপল্লব কিছু আর নজর হয় না।

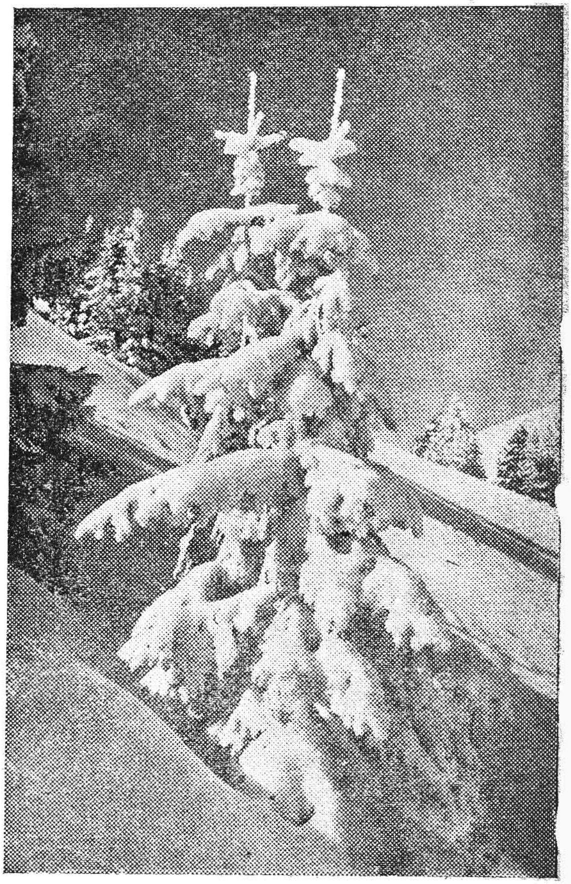

পাইন গাছের ওপর বরফ জমেছে

দু'একজন রেল কর্মচারী কাজের তাগিদে নিতান্ত বাধ্য হয়েই স্টেশনের কাছে ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁদের বিশ মণ ভারী ওভারকোটের বহর দেখেই অনুমান করা যায় কি প্রচণ্ড প্রকোপ বাহিরের হাড়-কাঁপানো শীতের। কিন্তু বাহিরে যেমনই হোক, গাড়ির মধ্যে চমৎকার গরম। আমাদের মাথার কাছে ছিল তাপনিয়ন্ত্রক 'রেগুলেটর'। তার পাশে একদিকে লেখা 'Warm' (গরম) আর একদিকে লেখা 'Kalt' (ঠাণ্ডা)। দেখে নিলাম রেগুলেটরটা Warmএর দিকেই ঠিক ঘোরানো আছে। ভুলক্রমে Kalt-এর দিকে ঘোরানো থাকলে ঠাণ্ডায় যে কি অবস্থা হোতো, তা' তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

গাড়ির ওদিকে বসেছিলেন কজন জার্মান মহিলা; তাঁরাও চলেছেন 'হলিডে' করতে। এতক্ষণ আলাপ হয় নি। কিন্তু আনন্দের উচ্ছ্বাসে ক্রমে তাঁরাও হয়ে উঠলেন আমাদের মতন চঞ্চল ও প্রগল্‌ভ। ভাষার বাধা, অপরিচয়ের সংকোচ কিছুই আর রইল না।

পথে পড়ল তুষারাচ্ছন্ন এক সুন্দর পাহাড়। এক জার্মান তরুণী অঙ্গুলি নির্দেশে সেই

দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখর হয়ে উঠলেন,—বার্গ, বার্গ! অর্থাৎ পাহাড়, পাহাড় !

ক্ষণপরে একটি সুদৃশ্য হ্রদ দেখে আবার সেই উল্লাস ও উত্তেজনা,—সি, সি ! (হ্রদ, হ্রদ)

উত্তেজনার নিবৃত্তি হোলো একটু পরে। তখন তাঁর এক সঙ্গিনী আলাপ জমাবার প্রচলিত পন্থা অবলম্বন করে চকোলেটের একটি ঠোঙা আমাদের দিকে এগিয়ে ধরে মৃদু হেসে বললেন,—'বিতে' অর্থাৎ অনুগ্রহ (করে গ্রহণ) করুন।

আমরা একটি করে চকোলেট তুলে নিয়ে জার্মান ভাষাতেই ধন্যবাদ জানালুম,—ডাঙ্কে।

ওঁদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী মহিলা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারেন। সুতরাং বাহিরের দৃশ্য উপভোগ করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরই সঙ্গে চলল আলাপ।

বেলা পাঁচটায় গাড়ী দাঁড়াল 'লিণ্ডাউ' (Lindau) স্টেশনে, এক বিশাল হ্রদের তীর ঘেঁসে। সে যে কি অপরূপ দৃশ্য, যে নিজে না দেখেছে তাকে বোঝাতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। আকাশের মেঘ তখন পাতলা হয়ে এসেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে প্রখর সূর্যালোক ঝিলিক দিচ্ছে। সেই আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে হ্রদের নীল জলে, বরফ-ঢাকা বৃক্ষ শাখায়, তুষারমণ্ডিত শৈলচূড়ায়। হ্রদের বুকে ভাসছে পালতোলা সুদৃশ্য নৌকা, ছোট ছোট শ্বেতবর্ণ স্টিমার। মনে হয় সব বুঝি স্বপ্ন !

কিন্তু মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল অস্ট্রীয়া ও জার্মানীর অরসিক পাশপোর্ট পরীক্ষকদের শুভাগমনে। তার সঙ্গে এলেন আবার শুল্ক অফিসের কর্মচারীরা। লিণ্ডাউ ছাড়ালেই এবার আমরা জার্মানী থেকে অস্ট্রীয়া রাজ্যে প্রবেশ করব, তাই এত আয়োজন। কর্মচারীরা কোন গোলমালের সৃষ্টি না করে এবং অনর্থক কোন যাত্রীকে উত্ত্যক্ত না করে যত শীঘ্র সম্ভব অতি সুশৃঙ্খল ও ভদ্রভাবে স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে চলে গেলেন। তাঁদের আচরণে অকারণ প্রভুত্ব জাহিরের কোন চেষ্টা নেই, এই জিনিসটাই খুব তারিফের যোগ্য মনে হোলো।

লিণ্ডাউ থেকে চলেছি হ্রদের তীর ঘেঁসে। তখন আকাশও মেঘমুক্ত হয়েছে। ওপরে নীল নির্মেঘ আকাশ, নীচে রৌদ্র ঝলমল হ্রদ আর দূরে পাহাড়ের মাথায় তুষারের মুকুট এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। এমন অপরূপ সৌন্দর্য এখানেই ? তবে সুইটজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য কেমন ?

মানচিত্র গাড়ির ভিতরেই ফিট করা ছিল। সহযাত্রিণী বর্ষীয়সী মহিলা বুঝিয়ে দিলেন, এই স্থানের সৌন্দর্য সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দু'শ সাত বর্গ মাইল আয়তনের এই বিশাল হ্রদ জার্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড আর অস্ট্রীয়া এই তিন রাজ্যের এলাকার মধ্যেই পড়ে। এর উত্তরপূর্ব তটরেখার অধিকাংশ জার্মানীর ও দক্ষিণ পশ্চিম তটরেখা সুইটজারল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বপ্রান্তের তটরেখার সামান্য কিছু অংশ অস্ট্রীয়ার এলাকাভুক্ত। এই বিখ্যাত হ্রদের নাম Lake of Constance (কন্সটান্স হ্রদ)। কিন্তু জার্মানরা একে বলে Bodensee (বোডেনসি) অথবা Swabian Lake (সোয়াবিয়ান হ্রদ)। তিনটি রাজ্যের এলাকাভুক্ত হলেও এই হ্রদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুইটজারল্যাণ্ডের প্রকৃতির নির্দেশ যতটা দেয়, অপর কোন রাজ্যের ততটা দেয় না। সুইটজারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই হ্রদটি আট শ সাতাশ ফুট গভীর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে খাস জার্মানী তো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের নিকটবর্তী এই জার্মান অঞ্চলটুকু ছিল অটুট, অক্ষত।

গাড়ি এসে দাঁড়াল হ্রদের তীরবর্তী 'বৃগেঞ্জ' (Bregenz) স্টেশনে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে লিণ্ডাউ থেকে বৃগেঞ্জ পর্যন্ত এই রেলপথের শোভার তুলনা হয় না। অস্ট্রীয়ার এক বন্দর এই বৃগেঞ্জ। সহযাত্রিণীরা এখানেই নামবেন। নামবার আগে কামনা জানালেন আমাদের ভ্রমণ যেন আনন্দপ্রদ হয়। এই শুভেচ্ছার জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

প্ল্যাটফরমে নেমে তাঁরা বিদায় সম্ভাষণ করলেন,—অ ভিদেরশেন !

আমরাও তাঁদের কথার পুনরাবৃত্তি করে বিদায় জানালাম,—অ ভিদেরশেন !

পথে-পাওয়া ক্ষণিকের বান্ধবীদের হারিয়ে মনটা ক্ষণকালের জন্যে উদাস হয়ে গেল।

গাড়ি চলেছে কখনও হ্রদের তট ঘেঁসে, আবার কখনও কিছু দূরে দূরে। হ্রদ কখনও এগিয়ে

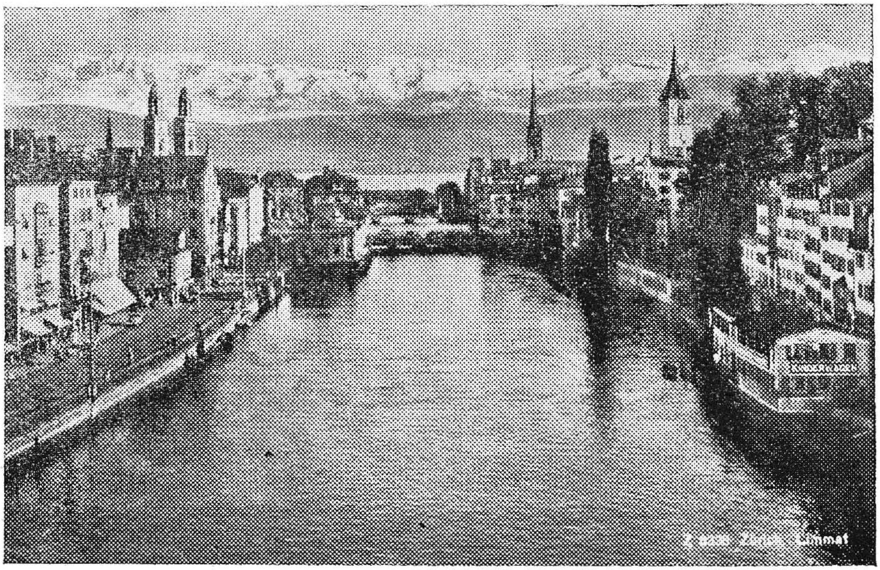

লিণ্ডাউ নদীর তীরে জুরিক শহর—পশ্চাতে জুরিক হ্রদ ও আল্পস পর্বতশ্রেণী

আসছে যেন আমাদের ধরা দিতে, আবার পরক্ষণেই আত্মগোপন করছে তরুবীথি বা লোকালয়ের অন্তরালে ; যেন নীল শাড়ী পরা কৌতুকময়ী চঞ্চলা একটি মেয়ে লুকোচুরি খেলছে আমাদের সঙ্গে।

সেন্ট মারগ্রেথেন (St. Margrethen) স্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াল। অস্ট্রীয়া ও সুইটজারল্যাণ্ডের সীমান্ত স্টেশন বলে এখানে আবার পূর্বের মতন ঐ দুই গভর্নমেণ্টের পাসপোর্ট পরীক্ষক ও শুল্ক অফিসের কর্মচারীরা এসে যথারীতি পরীক্ষাদি করে চলে গেলেন। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যাঁরা সুইস মুদ্রা নিতে চান, একজন কর্মচারী এসে তাঁদের মুদ্রা ভাঙিয়ে দিলেন। কারণ একদেশের মুদ্রা, অন্য দেশে অচল।

হ্রদ ইতিমধ্যে একটু পেছনে পড়েছিল। আবার হ্রদের নিবিড় সান্নিধ্যে এলাম 'রর্সচাচ'

(Rorschach) স্টেশনে। অনেক যাত্রী নেমে গেলেন এখানে। রর্সচাচ যে এই হ্রদের তীরবর্তী খুব বর্দ্ধিষ্ণু সুইস শহর—কেবল তাই নয়, বড় পোতাশ্রয় ও বাণিজ্যকেন্দ্রও বটে। বিমান-ঘাঁটিও এখান থেকে দূর নয়। অদূরবর্তী 'রর্সচাচের বার্গ' পর্বতের পাদদেশে শান্ত সুন্দর প্রতিবেশে অবসর যাপনের জন্যে আছে ছোট ছোট গ্রাম। 'হিডেন'-এর (Heiden) স্বাস্থ্য নিবাসের অবস্থিতিও এই পর্বতেরই ওপরে। রেড ক্রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনাণ্টের (Henri Dunant) নাম নিশ্চয় তোমাদের অজানা নয়। তাঁর কর্মবহুল জীবনের শেষ আঠার বৎসর অতিবাহিত হয় এখানকারই এক চিকিৎসালয়ে।

মধ্যপথে এক দীর্ঘ টানেল অতিক্রম করে এলাম 'রর্সচাচ' থেকে 'সেণ্টগলে' (St. Gall)। টানেলে প্রবেশ করতেই অন্ধকারের সমুদ্রে যেন গাড়িটা ডুবে গেল। কি গভীর অন্ধকার! কোলের মানুষ চেনা যায় না। ঘড়ি দেখার খেয়াল ছিল না। তা' হোলেও মনে হোলো তিন চার মিনিট লেগেছে টানেলটি পার হোতে।

কন্সটান্স হ্রদের তখন আর দর্শন নেই। কৌতুকময়ী নীলবসনা মেয়েটি তখন পলাতকা। কেমন করে জানবে সে—এই বিরাট লৌহ সরীসৃপটা এমন অতর্কিতে পর্বতগহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়বে!

গাড়ি উইল (Wil) স্টেশনে দাঁড়াতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম দূরে নীল আকাশের পটে শুভ্র তুষারাবৃত গিরিমালার অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে। নীরব অভিনন্দন জানালাম সেই সব স্থপতিদের যাঁরা রেলপথ নিয়ে গেছেন প্রকৃতির এই সব সুনির্বাচিত লীলাক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে।

প্রায় সাড়ে সাতটায় 'জুরিক' (Zurich) স্টেশনে যখন নামলাম, দিনের আলো তখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। স্টেশনে যেখানে Handgepack লেখা আছে, সেখানে লাস্টমিনিট ব্যাগ দুটি ছাড়া আর সব মাল জমা করে দিয়ে রসিদ নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম আশ্রয়ের সন্ধানে। (চলবে)

● গল্প হলেও সত্যি

হাজারিবাগের গঙ্গাতীরে বসে এক নারী মা-গঙ্গার কাছে আকুতি জানায়—"দে মা একটি ছেলে দে এবার! পাঁঠা দেব তোকে!"

মা বুঝি তার কথা শুনলেন। এবার তার ছেলেই হ'ল।

তার আনন্দ আর ধরে না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আর মা-গঙ্গার করুণার কথা ভেবে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে যায়।

ছেলে বড় হ'ল। এইবার মায়ের পুজোটা দিতে হয়। পাঁঠা আনা হ'ল।

শুভদিন দেখে সে পুজো দিতে গেল। এক কোলে ছেলে, অন্য কোলে ছাগ-শিশু।

"নে মা, আমার পুজো নে!"—কোল থেকে পুজোর বলি গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে পিছন ফিরল! আদরের নিধিকে বুকে দোলাতে দোলাতে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। মা-গঙ্গা তার কামনা পূর্ণ করেছেন, সে-ও মা-গঙ্গার মানত শোধ করেছে।

"ও সই! পাঁঠাটাকে অত ক'রে আদর করছিস! ছেলে কোথায় তোর?"

চমকে উঠল অভাগিনী—। পাঁঠার বদলে সে নিজের সন্তানকেই বিসর্জন দিয়ে এসেছে মা গঙ্গার কোলে।

বাহাদুর শাহ্

—ডাঃ শ্রীধর সেনাপতি

জ্যোৎস্না-ভরা রাতে ছোট ডোবাটার কাছে বুনো হাতির দলটা নেমে এল।

গ্রীষ্মের শেষাশেষি। নদীর বুকে সাদা সাদা হাড়ের মত শিলানুড়িগুলোকে জলে কাদায় বালিতে মাখামাখি করে তচ্‌নচ্‌ করে দিলে তারা। কাছেই পাহাড়ের গায়ে ছোট ডোবার জলটুকুও চঞ্চল হয়ে উঠলো—ঝলসে উঠলো যেন চাঁদের রূপালী আগুনে।

এমন সময়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটি ছায়া। যেন সেই পাহাড়েরই একটা অংশ কোন কারণে ভেঙে বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে। চাঁদের আলোয় রূপ নিলে সেই ছায়া।

বিশাল এক হাতি! কিন্তু তার থামের মত চারটি পায়েও তার দেহের ভারসাম্য সে রক্ষা করতে পারছে না। হাতিটার দেহ দুলছে। তার শুঁড়ের ওপরে আঁকা সোনালী রঙের নক্সা চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করে উঠেছে। অসুস্থ সে।

তবু—এই দুর্বল মুহূর্তেও, বাহাদুর শাহ্‌র দৃষ্টির তুলনা হয় না। কালো—কুচ্‌কুচে কালো গায়ের চামড়া, চমৎকার শুঁড়, বাহাদুর শাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব যেন প্রতিপন্ন করছে। প্রায় দু'শ ভরি ওজনের দুটি দাঁত বহন করছে প্রকাণ্ড মাথাটা!

খেদার হাতি ছিল বাহাদুর শাহ্‌। তার ইঞ্চি পরিমাণ পুরু গায়ের চামড়ায় খেদা-লড়াইয়ে পাওয়া অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। বাঘের থাবার দাগও পিঠের একদিকে বহন করছে সে।

এ দলের দলপতি দেখলো তাকে। চঞ্চল হয়ে উঠলো। চ্যাপ্টা হয়ে উঠলো কানদুটো। তার দেহটাও খুব ছোট নয়। কিন্তু একটি দাঁত তার ভাঙা। সেটার ছুঁচালো অগ্রভাগ বড় দাঁতটির চেয়েও মারাত্মক। নদীর জল, কাদা, বালি এখনও গড়িয়ে পড়ছে তার দেহ থেকে। গলার ভাঁজের কাছে কিছু বন্যলতা আর বাঁশপাতা লেগে আছে এখনও—জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসবার সময়ে সে আহারকার্য সমাধা করেছে বোঝা যায়।

ছোটবড় মিলিয়ে অনেকগুলি হাতি। দল বেঁধে সবাই তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। দুটো বুড়ো হাতিও আছে। বাচ্চা হাতিগুলো বড় হাতিদের পেটের তলায় আশ্রয় নিলে। চাঁদের আলোয় তাদের সাদা দেখাচ্ছে; চোখগুলো ডুবো-ডুবো। কলাপাতার মত নড়ছে তাদের কান।

হঠাৎ তাদের দলপতি সামনের দুটি পা তুলে প্রচণ্ড আক্রোশে যেন ফেটে পড়লো। তার সামনে ছুটে গেল তার প্রকাণ্ড কালো বেলুনের মত ছায়াটা।

উত্তর ভারতের খেদা-লড়াইয়ের হাতি বাহাদুর শাহ্। দৈত্যের মত ক্ষমতা ছিল যার একদিন—আজ সে অসুস্থ। বিপদ বুঝলো সে। ইতস্ততঃ করলো। হৃদ্‌পিণ্ডের প্রতিটি কম্পন তার দুর্বল দেহে ফুটে উঠেছে।

বাহাদুর শাহ্ সভয়ে পিছু হটলো। তারপর যখন দেখলো যে তাকে কেউ অনুসরণ করছে না, তখন আবার ঘুরে দাঁড়ালো। দূর থেকে অসুস্থ কম্পিত দেহে সে লক্ষ্য করতে লাগলো সেই হাতির দলটিকে।

হাতির দলটি এবার শব্দ করতে করতে জল থেকে উঠে এল। চাঁদের আলো-লাগা নদীর চিক্‌চিকে বালির ওপর দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরলো তারা। গাছের ফাঁক দিয়ে বড় বড় ধোঁয়ার বলের মত মিলিয়ে গেল।

বাহাদুর শাহ্ অনুসরণ করলো তাদের।

খুবই অসুস্থ সে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও তার পক্ষে শক্ত। তবু সে তাদের পিছু নিলে। জঙ্গলের ছোট ছোট গাছ, এমন কি ঘাসও তার বুকে লেগে অগ্রগমনে বাধার সৃষ্টি করতে লাগলো। সেই বাধা ঠেলে অগ্রসর হবার মত শক্তি আর সাহসের অভাব অনুভব করলো এখন বাহাদুর শাহ্। সে একই পথ ধরবার চেষ্টা করলো—যে পথ দিয়ে অতগুলো হাতি জঙ্গলের ওই রকম ছোট ছোট গাছ আর ঘাস পা দিয়ে মাড়িয়ে দুমড়ে একাকার করে দিয়ে যাচ্ছে। সেই পথে চলাই এখন তার পক্ষে সহজ হবে।

এদিকে ওদিকে একপাল শূয়োর। ময়ূরের ঝাঁক। শজারু কাঁটা নাড়ছে। গাছের শাখায় শাখায় বানরদের লাফালাফি—নীচে ভীড় করেছে চিতা হরিণের দল। বানরদের লাফালাফি আর দাপাদাপিতে গাছ থেকে ফুল কুঁড়ি পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে—হরিণদের ভোজের মস্ত সুযোগ! কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে গাছের ওপরের ওই প্রহরীরাই তাদের সতর্ক করে দেবে!···

এদেরই ভেতর দিয়ে বুনোহাতির দলটি জমকালোভাবে এগিয়ে চললো।

মৃত্যুপথযাত্রী বাহাদুর শাহ্ যতই তাদের দেখে, ততই তার শিরা-উপশিরায় অনুভব করে সে জীবনের আহ্বান! বাঁচতে হবে—কোনক্রমেই মৃত্যুর কাছে সে সহজে পরাজয় স্বীকার করবে না।···

এইসব বুনো হাতিরা নচন্দ্ররাজ্যের রাজকীয় হাতিশালার কথা জানে না। দেখেনি হলদে সোনালী নানান্ বর্ণের হাতির পোশাক আর হাওদা। সে জীবনে বাহাদুর শাহ্ সুখী ছিল। তার ছিল প্রিয় মাহুত।

একদিন সে মারা গেল !

তাকে খুঁজতে লাগলো বাহাদুর শাহ্। সেই স্মরণীয় দিনগুলোতে ওই একটি লোকের জন্যে সে কি না করেছে ? আর, ওই মানুষটির হাতেই লালিত-পালিত হয়ে দু'দিনের হস্তী-শাবক এত বড়টি হয়েছে !

বাহাদুর শাহ্ তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মাহুতকে আর খুঁজে পেল না। অন্য একটি লোক তার কাঁধে চাপলো। একেবারে বিবেকবুদ্ধিহীন। তার ব্যবহার পছন্দ হলো না বাহাদুর শাহ্র। অবাধ্য হয়ে উঠলো সে।...

তার আদেশ অমান্য করবে বাহাদুর শাহ্? মাথা নত করবে না তার হুকুমের কাছে ? নতুন মাহুত বাহাদুর শাহ্র একেবারে মাথার ঠিক মধ্যস্থলে অঙ্কুশের বাঁকামুখ সজোরে দিলে বসিয়ে।

আচমকা আঘাত পেয়ে বিশাল দেহটা তীব্রভাবে পাক খেয়ে উঠেছিল বাহাদুর শাহ্র। নতুন মাহুত নীচে পড়ে গিয়েছিল ! তারপর কিছুটা কৌতূহল আর কিছুটা রাগে একটা পা দিয়ে মাহুতের নিথর দেহটা একটু উল্টে দেখতে চেয়েছিল সে। তার প্রিয় মাহুতের জায়গায় এ লোকটাকে আর তার পিঠে বসতে দিতে ঘৃণাবোধ হলো। বাহাদুর শাহ্র পায়ের নীচে পিষে মরলো লোকটা। সেই স্বরু !

সাধারণতঃ পোষাহাতি কোন কারণে পালিয়ে গেলে তাকে আবার বন্দী করে আনা হয়। বাহাদুর শাহ্র পিছনেও লোকজন ছুটেছিল বৈকি। কিন্তু অনেক কৌশল, অনেক চতুরতার প্রয়োজন হয়েছে বাহাদুর শাহ্র তাদের কাছ থেকে এভাবে দূরে পালিয়ে আসার জন্যে। তার পিছনে যারা ছুটেছিল, তাদের ভেতরে তার পরিচিত প্রিয় মাহুতের ডাক সে শুনতে পায়নি। পালাতে পালাতে বাহাদুর শাহ্ দেখলো তার অনুসরণকারীরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সে। গতি কমিয়ে দিলে। আর, এই স্বযোগে দুটি লোক দৌড়তে দৌড়তে একেবারে তার নাগালের মধ্যে এসে গেল ! ক্রোধে উন্মত্ত বাহাদুর শাহ্ এ লোকদুটিকেও চরম শাস্তি দিলে।

তখন ঘোষণা করা হলো—পাগলা হাতি বাহাদুর শাহ্কে বিষমাখানো চাবুক মেরে শায়েস্তা করা হবে। মহারাজার হুকুম ! !

বাহাদুর শাহ্ এইভাবে বিতাড়িত হয়েছে জঙ্গলে।...

পাঁচ পাঁচটা দিন বুনোহাতির ওই দলটির পিছনে পিছনে ঘুরলো বাহাদুর শাহ্। যতদূর গেছে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্যে যেন শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছে তাকে। হয়তো এই দলটিকে দেখে তার ভেতরে যে প্রবৃত্তিগুলো জেগে ওঠেছিল—এর জন্যে দায়ী। এমনও হতে পারে, তার পেশী-সঞ্চালনের আরও প্রয়োজন ছিল। যাই হোক্, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে তার কবর থেকে নিজেকে

টেনে তুললো। বিশাল ক্ষমতা ফিরে পেল সে। রক্তের মধ্যে যেন তা' অনুভব করতে লাগলো বাহাদুর শাহ্!

এই সময়ে সুরু হলো বর্ষা। ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি লাগলো জঙ্গলে। আকাশে কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের ভ্রূকুটি! সূর্য ঢাকা পড়েছে।

বিশাল শরীর নতুন শক্তি নিয়ে বাহাদুর শাহ্ সেই বুনো হাতির দলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবার। দলের দলপতির দুষ্টামিভরা চোখ অতি ক্রোধে পদ্মরাগমণির মত জ্বলে উঠলো। কান দুটো পিছনদিকে চ্যাপ্টা হয়ে ঘাড়ের সঙ্গে লেগে গেল—বেঁকে গেল শুঁড়টা।

প্রায় একই সঙ্গে সামনাসামনি এগিয়ে এল দুই হাতি। একটা গম্ভীর ঘর্ষণের শব্দ উঠলো। মাথায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করলো দু'জনে দু'জনের প্রতি। একটিকে এখনি এখান থেকে পালাতে হবে, তা' না হলে বিজয়ীর কাছে স্বীকার করতে হবে বশ্যতা।

রাত্রি এল। সঙ্গে বৃষ্টি। কল কল করে অঝোরে বর্ষণ হতে লাগলো মেঘে-ঢাকা কালো আকাশ থেকে। পাহাড়ে পাহাড়ে বজ্র গর্জন করে উঠলো। আর—সেই বর্ষণমুখর জঙ্গলে বজ্রের ধ্বনি ছাপিয়ে তাদের লড়াইয়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো মুহুর্মুহুঃ।···

যখন সকাল হলো, যুদ্ধে রত দুই হাতির ওপরে এসে পড়লো রক্তাভ সূর্যের আলো। বাদামী রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে বাহাদুর শাহ্‌র কপাল্। একটা তাজা রক্তের ক্ষীণধারা গড়িয়ে পড়ছে সেই সঙ্গে!

তিনদিন তিনরাত্রি চললো সে লড়াই! প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড় বয়ে গেছে তাদের ওপর দিয়ে। প্রভাত সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে ; রাতের আকাশ তারার মালা দুলিয়ে দিয়েছে ঝিল্‌মিল্ করে কখন, তা' তারা জানে না। জঙ্গলের চার পাঁচ একর জমি তাদের পায়ের নীচে পড়ে দলিত মথিত হয়ে গেছে।

তৃতীয় দিন! মাংস-পেশীতে কল্পনাতীত অসহ্য ব্যথা নিয়ে ক্ষতবিক্ষত বাহাদুর শাহ্ তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছন দিকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হলো অবশেষে। পরাজিত দলপতি দুর্বল পায়ে টলতে টলতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বাহাদুর শাহ্‌র ক্ষমতাও আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে? রীতিমত হাঁফাচ্ছে—ক্লান্ত অবসন্ন সে-ও! গায়ের চামড়া জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত শুকিয়ে খস্ খস্ করছে। বিজিত দলপতির পিছনে ধাওয়া করার শক্তি তার নেই!

কিন্তু এখন তার জয়ের আনন্দ উপভোগ করার সময়—সবুজ জলাশয় আর ছায়াঘন অরণ্য-বীথিকা···বনে আপন সাথীদের সঙ্গ লাভ।

দূরে দাঁড়িয়ে হাতির দলটি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছে! বাহাদুর শাহ্ সঙ্গলাভের আশায় তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

তাদের দলপতিকে এই হাতিটা লড়াইয়ে হারিয়ে দিলে না? এখন একে খুব দুর্বল মনে হলেও এর কাছ থেকে মানুষের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না কি? এখনি তাদের কী করা উচিত তা' ঠিক করতে না পেরে ভয় পেয়ে একটি একটি করে দূরে সরে যেতে লাগলো তারা।

মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে আসা বাহাদুর শাহ্ এখন নিজের বন্য-সমাজেও কি উপেক্ষিত? কী করবে সে এখন? লজ্জিতভাবে হতবুদ্ধি হয়ে কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে অসুখী বাহাদুর শাহ্! তারপর সহসা জলের প্রয়োজন বোধ করে সে। খেদায় ধরা পড়া হাতির দলকে একদিন যেভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো সে, এখনও ঠিক তাই করে! সমস্ত দলটিকে দশ মিনিটের মধ্যে বাহাদুর শাহ্ তাড়িয়ে নিয়ে আসে জঙ্গলের মধ্যে নদীর ধারে।

বর্ষা আরম্ভ হবার একদিন বা দুদিন আগে ঠিক এই জায়গা দিয়ে নদীর ওপার থেকে এপারে এসে পৌঁচেছিল এ দলটি। এখন বাহাদুর শাহ্ চেস্টা করে যাতে সমস্ত হাতি আবার ঠিক ওই জায়গা দিয়েই অতিক্রম করে ওপারের জঙ্গলে গিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু আবার হাতির দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে। বিদ্রোহ ঘোষণা করছে তারা। বাহাদুর শাহ্‌র নেতৃত্বকে তারা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না!

এদিকে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে বাহাদুর শাহ্‌র! বর্ষার ভরা নদী তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। ওই নদীতে নেমে এখনি আকণ্ঠ জলপানে তার বাধা কী? তৃষ্ণার্ত বাহাদুর শাহ্ এগিয়ে গেল। নদীর পাড়েই কিছুটা বালি জমে চিক্‌চিক্ করছে। সেটুকু অতিক্রম করেই একেবারে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বাহাদুর শাহ্।...

কিন্তু তার পায়ের নীচের সেই বালি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো!

সেই বালিতে বাহাদুর শাহ্ পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুর্ সুর্ করে তা' সরে যেতে লাগলো। তার চারটি পা-ই বেশ কিছুটা ডুবে গেল বালির মধ্যে! বর্ষার সময়ে নদীর বুকে এরকম চোরা-বালি জমে কোথাও কোথাও!

সভয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে আসবার চেস্টা করলো বাহাদুর শাহ্। ফলে আরও কিছুটা গেল সে ডুবে! তার বিশাল দেহটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! নদীর চোরাবালি এবার মৃত্যু-আলিঙ্গন দিয়েছে বাহাদুর শাহ্‌কে!

বাহাদুর শাহ্ প্রাণভয়ে কাতর আর্তনাদ করে ওঠে এবার! দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে বালির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চায় সে! বালি তখন তার উদর স্পর্শ করেছে! শীঘ্রই হয়তো তার মাথা ছাড়া দেহের সবটুকু অংশই ওর

নীচে চলে যাবে। তারপর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার আগে ওর লম্বা শুঁড়টা আরও লম্বা হয়ে মুক্তির শ্বাস নেবার ব্যর্থ আশায় ছট্‌ফট্ করবে হয়তো !···

তীরে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে হাতীর দলটি অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করে—কিন্তু নিরুপায় তারা ! একটি লম্বা ঘাস। বাহাদুর শাহ্‌র নাগালের মধ্যে। সেই ঘাসটির গায়ে শুঁড় লাগায় বাহাদুর শাহ্ বারবার !

বাহাদুর শাহ্‌র সেই ইঙ্গিতের অর্থ খুঁজে পায় একটি বাচ্চা হাতি। কাছেই নদীর তীরে একটি ছোট গাছের গুঁড়িতে মাথা লাগিয়ে প্রাণপণে ঠেল্‌তে থাকে সে ! নত হয়ে পড়লো সেই গাছ। চকিতে বাহাদুর শাহ্ শুঁড় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরলো সেই গাছের একটি শাখা। তার একটি পা বেরিয়ে এল বালির ভেতর থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমূল হয়ে সে গাছও পড়লো বাহাদুর শাহ্‌র সামনে। অবশ্য তার কাণ্ডের ওপরে একটা পা চাপিয়ে দিতে পারলো সে। কিন্তু তারপর ?

হাতির দলের সকলের মধ্যে এবার এ বোধ এসে গেছে—কী চায় বাহাদুর শাহ্ ! কী করলে ওই চোরাবালি থেকে উদ্ধার পাবে সে !···

একটি একটি করে তারা এবার প্রবেশ করলো জঙ্গলে। মাথা দিয়ে দৈত্যের ক্ষমতা নিয়ে তাদের বিশাল দেহের ভার রাখলো তারা গাছে গাছে। ছোটবড় গাছ নিমেষে ছিন্নমূল হয়ে মড় মড় শব্দে ভেঙে পড়তে লাগলো ! সেই সব গাছ ঠেলে ঠেলে পাঠিয়ে দিতে লাগলো তারা বাহাদুর শাহ্‌র কাছে। সমস্ত দলটি এখন তার উদ্ধার চাইছে !

গাছের সাহায্যে একটু একটু করে কম্পিত দুর্বল পা সেই চোরাবালির আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে আনলো বাহাদুর শাহ্। গাছের গুঁড়ির ওপরে উঠে বসলো সে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিন্নমূল গাছগুলোর ওপরে অতি সাবধানে দুর্বল পা রেখে রেখে তীরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো বাহাদুর শাহ্ ধীরে ধীরে।

তারপর একটা সফলতার আনন্দ বিদ্যুতের মত তার রক্তের মধ্যে নেচে উঠলো !

জঙ্গল তাকে ফিরিয়ে এনেছে অবশেষে।

এখন সে বনের নিজের স্বাধীন অধিবাসীদের পরিচালিত করতে পারে। আর—আর এই নির্জন বনভূমিতে তার নিজের শাবক শুঁড় দুলিয়ে মহানন্দে একটি একটি করে এক শতটি বৎসর কাটিয়েও দিয়ে যেতে পারে হয়তো। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল রঙিন্ স্বপ্ন দেখতে দেখতে এবার হাতির সমস্ত দলটিকে উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চলের দিকে পরিচালিত করে নিয়ে চললো বাহাদুর শাহ্ বিজয়গর্বে !

সে এখন এদের দলপতি !!

অজানার উজানে

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

এক

ঝির ঝির বাতাস বইছে ভোরবেলায়। কূলের কাছে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে দীঘার সমুদ্র। সূর্য এখনো ওঠে নি, কেবল একটা ধূসর আলো পূবের আকাশ থেকে ঠিকরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে সাগর-সৈকতে। দূরে দূরে আবছা কুয়াশা ; তার আড়ালে কী আছে, সহসা বোঝা যায় না।

দীপক মৃদু কদমে ছুটে বেড়াচ্ছে বেলাভূমিতে। এ তার নিত্যকার ব্যায়াম। পরনে নীল রংয়ের পাজামা, পায়ে রবার সোলের হাল্কা জুতো, গায়ে আবার ঐ নীল রংয়েরই বুশ শার্ট। নিজের কাঁচা সোনার মত গায়ের রংয়ের সাথে চমৎকার মানায় বলে নীল জামাকাপড়ই সে পরে থাকে।

বালিতে পা বসে যায়, বেশী জোরে ছুটবে—সাধ্য কী! তবু একটু তাড়াতাড়ি চলতে সুরু করল দীপক। সমুখপানে কুয়াশার আড়াল থেকে মানুষের কথা শোনা যায়। অনেকগুলো মানুষের কথা। এত ভোরে ওরা করে কি ওখানে ?

ক্রমে মানুষগুলোর মূর্তি চোখে পড়ে। শুধু মানুষ নয়। কূলের কিছু দূরে একখানা ট্রলার, মাছ-ধরা জাহাজ। তা' থেকে নৌকো-বোঝাই মাছ আসছে ডাঙার দিকে। এরই ভিতর বালির চড়ায় মাছ গাদা হয়েছে পাহাড় সমান।

একটা আধবুড়ো গাঁট্টা জোয়ান একপাশে দাঁড়িয়ে খুব জোর জোর কথা কইছে। দীপক সে-কথার এক বর্ণও বুঝতে পারে না। তার জানা কোন ভাষার কথা সে নয়। দীঘায় এসে নরওয়ের একখানা ট্রলার মাঝে মাঝে মাছ নামিয়ে দিয়ে যায়। আর কাঁথি থেকে লরী এসে সেগুলি নিয়ে যায় কলকাতায় পাঠাবার জন্যে—এসব খবর দীঘায় আসবার পর দীপক শুনেছে। তাই সাত-

পাঁচ মিলিয়ে সে অনুমান করল—এই লোকগুলি নরওয়ের লোক—পশ্চিম বাংলা সরকারের সঙ্গে চুক্তি ক'রে এরাই এসেছে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরবার জন্যে।

আধবুড়ো লোকটা দীপকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, কাজেই সে মোটেই বুঝতে পারেনি যে বাইরের একটা লোক এত কাছে এসে পড়েছে। সে আগের মতই ঘন ঘন চেঁচিয়ে যাচ্ছে; ভাষা না বুঝলেও দীপক এটা বুঝতে পারল যে নাবিকদের উপর ধমকধামকই সে চালাচ্ছে। লোকটা নিশ্চয়ই জাহাজের কোন উপরওয়ালা কর্মচারী—কাপ্তেন বা অন্ততঃ মেট।

ছুটতে ছুটতে পিছন থেকে এসে ঐ লোকটার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল দীপক। দুই এক মিনিট কেটে গেল, ওর চোখই পড়ল না দীপকের উপর। দীপক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—মাছের পাহাড় আর নাবিকদের ছুটোছুটি। দুটোই দেখবার মত। কত রকমের যে মাছ! কত রকম রং! কত রকম চেহারা!—আর নাবিকেরা? কী অসুরের মত পালোয়ান ওরা! কী রকম নীল চোখ আর লাল দাড়ি! কী রকম কলের মত কাজ ক'রে যাচ্ছে—টুঁ শব্দটি না ক'রে!

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল!

আধবুড়ো লোকটি মুখ ফেরাল হঠাৎ, এবং ফিরিয়েই দীপককে দেখে তর্জন ক'রে উঠল। নাবিকদের গায়ে নীল জামা, দীপকেরও তাই। ভোরের আলো তখনও ভাল ক'রে ফোটেনি, সেই আলো-আঁধারির মাঝে দীপকের মুখ সে ভাল দেখতে পেল না। না পেয়ে বোধ করি সে ভাবল—তারই একটা লোক কাজে ফাঁকি দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নবাবি করছে।

বারুদের মত দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল সে। ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে দীপকের নাকের উপর হাঁকাল এক প্রকাণ্ড ঘুসি!

দীপক সময়মত হুঁসিয়ার হতে না পারলে তার নাকটা বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে যেত সে-ঘুসিতে। ধপাস্ ক'রে সে মাটিতে ব'সে পড়ল, ঘুসিটা সোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল তার মাথার উপর দিয়ে; আর টাল সামলাতে না পেরে আধবুড়ো লোকটা দীপকের মাথা ডিঙিয়ে ডিগ্‌বাজি খেয়ে উল্‌টে পড়ল হাত-পাঁচেক তফাতে।

দীপক এক লাফে উঠে দাঁড়াল, আর ছুটে গিয়ে তার বুকের উপর ব'সে টুঁটি চেপে ধরল একেবারে!

লোকটা দম আটকে গাঁ গাঁ ক'রে উঠতেই সবগুলো নাবিকের চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে এসে পড়ল এদিক পানে। তাদের দলপতিকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর উঠে বসেছে একটা লোক—এ ব্যাপার দেখেই তারা দল বেঁধে এগিয়ে এল একটি লাফে; দীপককে টেনে তুলে কেউ ঘুসি, কেউ লাথি—চাঁদা ক'রে মারতে লাগল দরাজভাবে।

অবশেষে থামল তারা—যখন অজ্ঞান হয়ে দীপক মাটিতে প'ড়ে গেল। নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে তার, কাপড়জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, থেকে থেকে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে।

দলপতি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দম নিচ্ছিল এতক্ষণ। এইবার সে কী-যেন-একটা হুকুম করল তার লোকদের। এ-হুকুম কিন্তু হঠাৎ তামিল হ'ল না। দুই-একজন লোক ইতস্ততঃ ক'রে কী-যেন বলল তাকে; বোধ হয় ত' হুকুমটার প্রতিবাদই করল। বেশ খানিকটা তর্কাতর্কি চলতে লাগল।

মিনিট দুই পরে দীপকের অচেতন দেহটা ধরাধরি ক'রে নৌকায় নিয়ে তুলল ওরা ; তারপর নৌকা বেয়ে চলল জাহাজের দিকে।

হর্ন শোনা গেল একটা। কাঁথি থেকে লরী আসছে।

*　　*　　*　　*

দীপককে যখন ধরাধরি ক'রে জাহাজে তুলছে, তখন ডাঙা থেকে লরীর পুলিস জমাদার জিজ্ঞাসা করলেন—"ও লোকটির হয়েছে কী ?"

সঙ্গে দোভাষী ছিল, সে দলপতির কাছে প্রশ্ন করতেই দলপতি অম্লানবদনে জবাব দিল—"হাঙরে পা কেটে নিয়েছে একটা।"

জমাদার বললেন—"আহা-হা ! তাহলে এই লরীতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাক না লোকটাকে !"

উদাসীনভাবেই উত্তর করলে দলপতি—"কিছু দরকার নেই। আমাদের সঙ্গে ওষুধ আছে, দু'দিন লাগালেই ঘা শুকিয়ে যাবে। আর পা ? সে ত' হাঙরের পেটে ! হাসপাতাল ত' আর পা ফিরিয়ে দিতে পারবে না !"

জমাদার আর কী বলবে ?

জাহাজের নীচু ডেক-এ কিছুক্ষণ প'ড়ে থাকবার পর দীপকের জ্ঞান হল। তখন তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, মুখের ভিতরও রুমাল গোঁজা। হতাশ হয়ে সে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল শুধু। চড়ার উপর ওজন-কাঁটা খাটানো হয়েছে। মাছ ওজন হচ্ছে ক্রমাগত। ওজন হচ্ছে আর লরীতে চাপানো হচ্ছে ! ক্রমে সব মাছ উঠে গেল। তখন রসিদপত্র সইসাবুদের পালা।

দীপক জাহাজ থেকে দেখল—লরী ছেড়ে যাচ্ছে। তার বুকের ভিতরটা চড় চড় ক'রে উঠল। একবার কোন রকমেই কি ঐ লরীর লোকদের জানানো যায় না যে সে—পশ্চিম বাংলার স্বাধীন নাগরিক একজন—এই বিদেশী দুশমনদের জাহাজে বন্দী হয়ে আছে ? হয়ত তারা মেরেই ফেলবে তাকে ! হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ! মেরে ফেলবার মতলব না থাকলে কী জন্য তারা তাকে এভাবে ধ'রে এনে গুম ক'রে রাখবে !

দীপকের শোনা ছিল—জলে ডুবে যারা মরে, ডুববার মুহূর্তে পলকের ভিতর তাদের মনের পর্দার উপর দিয়ে গোটা অতীত জীবনটার ছবি একের-পর-এক দেখা দিয়ে যায়। দীপকেরও অনেকটা সেই রকমই হল। ঐ লরী স্টার্ট দিচ্ছে, ভট্‌ ভট্‌ শব্দ শোনা যায় এখান থেকে। এদিকে দীপকের মনে প'ড়ে যায় একের-পর-এক শৈশবের, কৈশোরের, প্রথম যৌবনের সবগুলি উজ্জ্বল মুহূর্ত—মায়ের কোল, সহপাঠীদের মুখ, আফিস-বন্ধুদের রঙ্গরস—সব-শেষ পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে দীঘায় হাওয়া-বদলের জন্যে আসা ! সব ফুরিয়ে গেল ! খেলা না জমতেই বেলাশেষের বাঁশী বেজে গেল ! দলপতি গুণ্ডাটা এইবার জাহাজে এসে উঠবে, আর বস্তায় পূরে তাকে ফেলে দেবে সমুদ্রের জলে !

কিন্তু—ও কা ?

হঠাৎ চোখ মেলে ভাল ক'রে তাকাল দীপক।

দলপতিও লরীতে উঠে বসল। সঙ্গে আরও দু'জন নাবিক।

দীপকের মাথা খুব সাফ। সে অনুমান ক'রে নিল—গুণ্ডাটা কাঁথি যাচ্ছে—খুব সম্ভবতঃ টাকা

আনতে, কিংবা জিনিসপত্র কিনতে। ফিরতে নিশ্চয়ই আজকার দিন কেটে যাবে ওর। কাজেই আজকার দিনটা সে বেঁচে গেল বোধ হয়।

ডাঙার দিকেই এতক্ষণ চোখ ছিল দীপকের। তার আশেপাশে জাহাজের উপর কী ঘটছে, তা' সে লক্ষ্যই করেনি। তাই হঠাৎ কানের কাছে মোলায়েম ইংরেজী কথা শুনে সে চমকে ফিরে তাকাল। একটি যুবক তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, নীল রংয়ের জামা তারও গায়ে, তবে বাহুতে, কাঁধের উপর উঁচু পদবীর চিহ্ন বিল্লা ও বোতাম! দীপক ভাবল—এ ছোকরা মেট-জাতীয় কিছু হবে।

হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

কিন্তু সে-অনুমানের চাইতে যে-চিন্তাটা এই মুহূর্তে বেশী ক'রে দীপকের মস্তিষ্ককে নাড়া দিচ্ছিল—তা' হল এই যে এই ছোকরাটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে! নিশ্চয় দেখেছে! অনেকবার দেখেছে! দেখেছে, কিন্তু এর নাম ধাম পরিচয় কিছুতেই সে মনে করতে পারছে না।

কথা কইছে—ঐ মেট ছেলেটি। পরিষ্কার ইংরেজীতে কথা কইছে। "আমি খুবই দুঃখিত। আমি তখন কূলে ছিলাম না, কিন্তু জাহাজ থেকে মোটামুটি ঘটনাটা আমি দেখেছি। দোষ আমাদের কাপ্তেনের। তিনিই তোমাকে প্রথম আক্রমণ করেছিলেন। তারপর এই অত্যাচার—এ একেবারে নিছক গুণ্ডামি। হবে না? ওর দেহে যে ভাইকিং দস্যুদের রক্ত আছে!"

বলতে বলতে সে নীচু হয়ে দীপকের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

দীপক যেন নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এক একবার মনে হচ্ছে—এটা স্বপ্ন। নিজের পায়ে চিম্‌টি কেটেও দেখল একবার। নাঃ—স্বপ্ন নয়!

তখন মুখ থেকে রুমাল বা'র ক'রে ফেলে সে বললে—"ধন্যবাদ! আরও ধন্যবাদ দেব, যদি এক কাপ চা খাওয়াতে পার। সকাল বেলার চা এখনো খেতে পাইনি।"

যুবকটি তার হাত ধ'রে তুলে নিয়ে গেল একটা ক্ষুদে কেবিনের ভিতর। কেবিন বললেও হয়,

তাকে গর্তও বলা চলে। দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা একখানা ছোট্ট টেবিল, আর সেই টেবিলের পায়ার সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা একটা ছোট্ট টুল। টুলের উপর দীপককে বসিয়ে, ছেলেটি নিজে বসল টেবিলের উপর।

একজন নাবিক এসে সমুখে নামিয়ে দিয়ে গেল দুই মগ চা আর কয়েক টুকরো মাখন-মাখা বিস্কিট।

মেট-ছেলেটি বললে—"চা খাও বন্ধু! কাপ্তেন যতক্ষণ না ফিরে আসে, আমিই জাহাজের কর্তা। ততক্ষণ, যতটুকু পারি—আরাম তোমায় দেব।"

কিন্তু দীপকের কানে তার কথা একবর্ণও প্রবেশ করছে না।

চায়ের মগে এক চুমুক দিয়েই সে সমুখের দেয়াল পানে চোখ তুলে তাকিয়েছে।

টেবিলের উপর মেট যেখানে বসেছে, তার ঠিক পাশেই দেয়ালের গায়ে একখানা আয়না।

পাশাপাশি দু'টি মুখ।

আয়নার ভিতর দীপকের মুখ। আর আয়নার পাশে এই অজানা অচেনা নরওয়েবাসী নাবিকের।

দীপক লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট চীৎকারও বেরিয়ে গেল বুঝি!

কেন যে এই ছেলেটিকে এত চেনা-চেনা মনে হয়েছিল, এতক্ষণে সে তা' স্পষ্ট বুঝতে পারল!

দীপকের আর এই ছেলেটির মুখের চেহারায় তিলমাত্র তফাৎ নেই! যমজ ভাই যেন ওরা!

দীপকের উত্তেজনা দেখে ও ছেলেটিও চঞ্চল হয়ে উঠল। হল কি তার বাঙ্গালী বন্ধুর? সে উঠে এসে দীপকের পাশে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল—"হল কি তোমার? এ-রকম করছ কেন?"

দীপক হঠাৎ কথা বলতে পারল না। বোবার মত হাত তুলে ইসারা করল। দেখিয়ে দিল আয়নার দিকে।

যুবক ফিরে তাকাল। আয়নার কাচে দেখতে পেল পাশাপাশি দু'খানি মুখ।

চমকাবার পালা এখন তার।

চমকালো দীপকের চাইতেও অনেক বেশী। থরথর ক'রে কেঁপে উঠল একেবারে।

একবার আয়না, একবার দীপক—তার চোখের দৃষ্টি ক্রমাগত ঘুরছে—একবার এ্দিকে, একবার ওদিকে। "দোহাই যীশু! দোহাই ভগবান্! দোহাই পবিত্র আত্মা!"—বিড়বিড় ক'রে আউড়ে যাচ্ছে তার কম্পিত অধর।

প্রথমে দীপকই সংযত হল। ওর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল—"এ কেমন ক'রে হয়? এর মানে কি? তুমি এর মানে বুঝতে পারছ কিছু?"

যুবকও নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করছে ততক্ষণ। অবশেষে মুখের বিড়বিড় আওয়াজ ক্রমশঃ থেমে এল; কিন্তু দেহের থরথর কাঁপুনি আর থামে না। আর চোখ? সে-চোখ তখনও মাঝে মাঝে এদিক থেকে ওদিকে ছুটছে—দীপকের মুখ থেকে আয়নার ভিতরে, আয়নার দিক থেকে দীপকের পানে।

অবশেষে সে কথা কইল—"তুমি নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তুমি—"

তার কথা আর অগ্রসর হয় না দেখে দীপক অধীরভাবে প্রশ্ন করল—"কী নিশ্চয়ই? আমি নিশ্চয়ই কী?"

"তোমার কোন পূর্বপুরুষ—হাজার বছর আগে—"

"হাজার বছর?"—এতখানি বিস্ময়ের ভিতরেও মুখে কৌতুকের হাসি ফুটল দীপকের।

"হাজার বছরই হল বই কি! আমার কাছে যে লেখন আছে, তার বয়স হাজার বছর!"

"লেখন? হাজার বছর বয়স? আমার সাথে তার—?" দীপক ঠাহর পাচ্ছে না যে সে হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, না জলে ডুবতে ডুবতে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

"আছে! লেখন আছে!"—কাঁপতে কাঁপতে টলতে টলতে যুবক বসল গিয়ে তার পুরোনো জায়গায়, টেবিলের উপর। গায়ের জামা খুলে ফেলল সে। ডান হাতের কনুইয়ের উপরে একখানা সোনার বাজু শক্ত ক'রে বাঁধা। তার উপর কৌশলে একটু চাপ দিতেই ডালাটা খুলে গেল।

ভিতরে ভাঁজ করা একখানা হলদে পাতলা চামড়া।

অতি-সাবধানে সেই চামড়ার ভাঁজ খুলল যুবক। এমন জীর্ণ যে মনে হয়—এখুনি এলিয়ে পড়বে। ধুলোর মত রেণু রেণু হয়ে হাওয়ায় মিশে যাবে। সেই চামড়া টেবিলের উপর যত্ন ক'রে পেতে সে তার উপর চোখ বুলোতে লাগল।

"তুমি পড়তে পারবে না, এ আমাদের নরওয়ে দেশের ভাষায় লেখা। কিন্তু এতে লেখা আছে—এই যে—রাঘু র‍্যামরো! হাজার বছর আগে বাংলাদেশ থেকে রাঘু র‍্যামরো জাহাজ সাজিয়ে বাণিজ্য করতে যান নরওয়ের উত্তর সাগরে! শুনেছ তুমি? জানো তুমি?"

"রাঘু র‍্যামরো? না ত'!"—দীপক মাথা নেড়ে বলল—"বাংলাদেশ থেকে রাঘু র‍্যামরো? রাঘু র‍্যামরো ত' কোন বাঙ্গালীর নাম হতে পারে না!"

হঠাৎ সে তড়িতাহতের মত চমকে উঠল। "রাঘু র‍্যামরো? না, রঘুরাম রায়? নিশ্চয়ই তাই! আমারই পূর্বপুরুষ রঘুরাম রায়! তিনি বাণিজ্য করতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। কিংবদন্তীর মত তাঁর কথা আমাদের বংশে বহু পুরুষ ধ'রে শুনে আসছি আমরা। হাজার বছর? তা' হবে হয়ত। আমি রঘুরাম থেকে চৌত্রিশ পুরুষ। এক এক পুরুষে যদি ত্রিশ বছর ধরা যায়—"

দীপকের কথা শেষ হ'তে দিল না নরওয়ের ছেলেটি। সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল দীপককে। "তাঁর থেকে চৌত্রিশ পুরুষ নীচে তুমি? তুমি তাহ'লে আমার ভাই। আমিও রাঘু র‍্যামরো থেকে চৌত্রিশ পুরুষ নীচে। রাঘু র‍্যামরোর এক ছেলে ছিল এদেশে, তা' লেখা আছে ঐ চিঠিতে—আজোয়া র‍্যামরো। তুমি তাঁরই বংশধর। আর আমি—আমি হচ্ছি ওলাফ র‍্যামরোর বংশধর!—ওলাফ! রাঘু র‍্যামরোর নরওয়েতে যে পুত্র হয়—তার নাম ছিল ওলাফ র‍্যামরো।"

দীপক হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। "রঘুরাম রায়ের বংশের এক শাখা নরওয়েতে আছে?"

"আজ হাজার বছর ধ'রে আছে।" যুবক গর্বের হাসি হেসে বলল—"আজ হাজার বছর ধরে নরওয়েতে আছি আমরা। ঐ চামড়ার লেখনে লেখা আছে—রাঘু র‍্যামরোর কাহিনী। তোমায় আমি পড়ে শোনাব। রাঘু র‍্যামরোর কথা শোনাব—আর শোনাব তাঁর হারিয়ে যাওয়া রত্নভাণ্ডারের কথা—যে-রত্নভাণ্ডার খুঁজে পেলে তুমি আমি রাতারাতি রথচাইল্ড ব'নে যেতে পারি।" [ক্রমশঃ

"নয়নে বসন বাঁধিয়া—"

—শ্রীমলয়কান্তি বসু

ছোট গ্রাম, নাম রামবাটী।

সে গ্রামেই ছিল ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোল। টোলের ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী নয়। পরিবেশটা কিন্তু ছিল মনোরম। চারপাশে ছায়াঘেরা বীথিকা। মাঝে মাঝে নানারকম ফুলের ঝাড়। গন্ধ ছড়ায় তারা দিনরাত। পরিষ্কার ঝক্ঝকে সব, কোথাও এতটুকুও আবর্জনা নেই।

টোলের পাশেই পণ্ডিত মশাইএর বসতবাটী ও ঠাকুরঘর। রামচন্দ্রের পূজারী তিনি। ছোট মন্দির। ভেতরে রাম-সীতার যুগলমূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝক্ঝক্ করছে সব। ঘরের মেজেতে আলপনা আঁকা। মাটির ঘরে আলপনা-গুলোকে আরও সুন্দর দেখায়। একদিকে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, অপরদিকে একটি ধূপদানী। সুগন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে—ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘর। নিত্য পূজা হয় সেখানে। সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা আছে রাতে।

ঘনরাম চক্রবর্তী ব'লে একটি কিশোর একদিন ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোলে এসে

ভর্তি হ'ল। সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট ছেলে। মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ান চুল। আয়ত চোখ দু'টিতে সরলতার রঙ্ মাখানো। পণ্ডিত মশাই কোলে তুলে নিলেন তাকে—গ্রহণ করলেন অন্তর দিয়ে।

রোজ ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের পূজা হয়। এই নিত্যপূজার ফুল তোলার ভার ছিল টোলের পড়ুয়াদের ওপর। পালা ক'রে এক একদিন এক একজন ফুল তুলতে যেত। সুন্দর এ কাজ। যখন সাজি হাতে ফুলবাগানে এসে দাঁড়ায় আর রঙ্-বেরঙের ফুল তোলে, তখন মনটা পবিত্রতায় ভরে ওঠে। তাই ওই দায়িত্ব যখন যার কাঁধে এসে পড়ত, সেই খুসী হোত।

একদিন ঘনরামের পালা এল ফুল তোলার। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে শুভ্রবস্ত্র পরে হাসিমুখে সাজিহাতে চলল ঘনরাম বেগুন-বাড়িতে ফুল তুলতে। তার চয়ন করা ফুলে রামচন্দ্রের পূজা হবে ভেবে আনন্দে ভরে উঠল তার মন। নানা রকম ফুলে ভরে উঠল তার সাজি। তবুও খেয়াল নেই। খেয়াল হোল হঠাৎ পায়ে একটি বেগুন পাতার কাঁটা বিঁধে যাওয়াতে। যন্ত্রণা সুরু হোল। অথচ কাঁটা বের করার উপায় নেই। কাঁটা তুলতে গেলে পায়ে হাত দিতে হয়, আবার সেই হাত দিয়ে পূজার ফুল স্পর্শ করা চলে না। কি করা যায়? অগত্যা পায়ের কাঁটা পায়ে নিয়েই সে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ফুল রেখে এল। তারপর বাইরে এসে কাঁটা বের করে ফেলল। কেউ জানল না সে কথা।

কিছুক্ষণ পরে স্নান সেরে ভট্টাচার্য মশাই ঠাকুর-ঘরে পূজো করতে ঢুকলেন। পরনে শুভ্র পট্টবস্ত্র ; গায়ে শুভ্র উত্তরীয়, তার ভেতর থেকে শুভ্র উপবীত দেখা যাচ্ছে। মুখে রামনাম। ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রথমে তিনি প্রণাম করলেন বিগ্রহকে। তারপর দেব-মূর্তির পদস্পর্শ করতে গিয়ে চমকে উঠলেন তিনি—একি দেবমূর্তির পদতলে কাঁটাসুদ্ধ বেগুন পাতা বিঁধে আছে কেন? কে করল এমন কাজ!

তিনি তখন পড়ুয়াদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আসতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কার ফুল তোলার পালা ছিল?" ঘনরামের উত্তর এল—আমার। গুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ফুল কোথায় তুলেছিলে?" ঘনরামের উত্তর এল—বেগুন-বাড়িতে।

"ঠাকুরের পায়ে কাঁটাসুদ্ধ বেগুন পাতা বিঁধল কি ভাবে, জান?" প্রশ্ন করলেন গুরুদেব। চমকে উঠল ঘনরাম সে কথা শুনে—কই কাঁটা তো তার নিজের পায়ে বিঁধেছিল, ঠাকুরের পায়ে তো বেঁধেনি!

ঘনরাম কিছু বুঝতে না পারলেও গুরুদেব বুঝতে পারলেন সব। ভক্তের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে ভগবান সেই ব্যথাকে নিজে গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি ইষ্ট-

দেবের ওপর অভিমান করে ঘর ছেড়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। যাবার সময় ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললেন, "তুমি ঘনরামকে নিয়েই থাক; আমি আর তোমার পূজা করব না। সারা জীবন তোমার পূজা-অর্চনায় কাটালাম, কিন্তু আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করলে না, আর সামান্য পড়ুয়া ঘনরামের প্রতি এত অনুগ্রহ! কই, আমার কোন ব্যথা-বেদনায় তোমায় ত' কোনদিন কাতর হ'তে দেখিনি!'

বসতবাটী ছেড়ে ব্রাহ্মণ বাদশাহী রাস্তা ধরে চললেন। একে বৃদ্ধ, তায় প্রচণ্ড রৌদ্র। ক্লান্ত হ'য়ে তিনি পথের ধারে এক গাছের তলায় শুয়ে প'ড়ে তন্দ্রাবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ পরে দু'টি বেদে ছেলে-মেয়ে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা পুরী যাব কোন পথে?" ব্রাহ্মণ বললেন—"এ পথ দিয়েই পুরী যাওয়া যায়—আমারও পুরী যাওয়ার ইচ্ছে আছে—তোমরা এগিয়ে যাও, আমি পরে আসছি।" তারা চলে গেলে তিনি আবার তন্দ্রাবিষ্ট হলেন।

অল্পক্ষণ পরে আর একটি বেদে বালক এসে জিজ্ঞাসা করল, "আমার দাদা বৌদিকে এদিকে যেতে দেখেছ কি?" ব্রাহ্মণ বললেন, "তারা এ পথেই পুরী গেল।" বালকও সে পথে ছুটল। ব্রাহ্মণ পুনরায় চোখ বুজলেন, কিন্তু আবার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটল। গাছের ডাল থেকে একটা হনুমান ঝুপ করে ব্রাহ্মণের কোলে লাফিয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ চমকিয়ে লাফিয়ে উঠতেই হনুমান মানুষের ভাষায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করল —"ব্রাহ্মণ, তুমি কোথায় যাবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "পুরীতে যাব।" এই কথা শুনে হনুমান ক্রুদ্ধ হ'য়ে ভট্টাচার্যের গালে এক চড় বসিয়ে বলল, "চোখের উপর রাম-সীতা গেলেন, লক্ষ্মণ গেলেন; তাঁদের চিনতে পারলে না, তুমি; পুরী গিয়ে করবে কী? যাও, ঘরে ফিরে রামচন্দ্রের পূজা কর।" বলে হনুমান অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

পরিতপ্ত চিত্তে ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু ঠাকুর পূজার ভার আর নিজে নিতে সাহস করলেন না—ঘনরামের উপর দিলেন। ভগবান ত' আশে-পাশেই আছেন! কিন্তু তাঁকে দেখবার বা চিনবার দিব্যদৃষ্টি ত' তাঁর নেই। ঘনরামের আছে, সেই ভগবানের যোগ্য পূজারী।

এই ঘনরামই পরে ভগবান রামচন্দ্রের স্বপ্নাদেশ পেয়ে "ধর্ম-মঙ্গল" কাব্য রচনা ক'রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ড্রামঁ্যাণ্ড স্ট্রীটের হোটেল

—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বিকেলে প্রশান্তর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম।...
খবরটা শুনে অবধি মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

১লা অগস্ট। লণ্ডনে ব্যাঙ্ক-হলিডে। বিকেলে আলেকজেন্দ্রা প্যালেসের বিরাট চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মাটি থেকে এত উঁচুতে সে-চত্বর যে, সেখানে দাঁড়ালে লণ্ডনের পরিধি-সম্বন্ধে বেশ ধারণা করা যায়। উঁচু-নিচু জমির ওপর লণ্ডন শহর প্রতিষ্ঠিত। নল-দেওয়া অসংখ্য বাড়ির একটা অদ্ভুত নির্দেশ ফুটে উঠেছে চতুর্দিক জুড়ে। আর আশেপাশে অনবদ্য উদ্যানের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য!

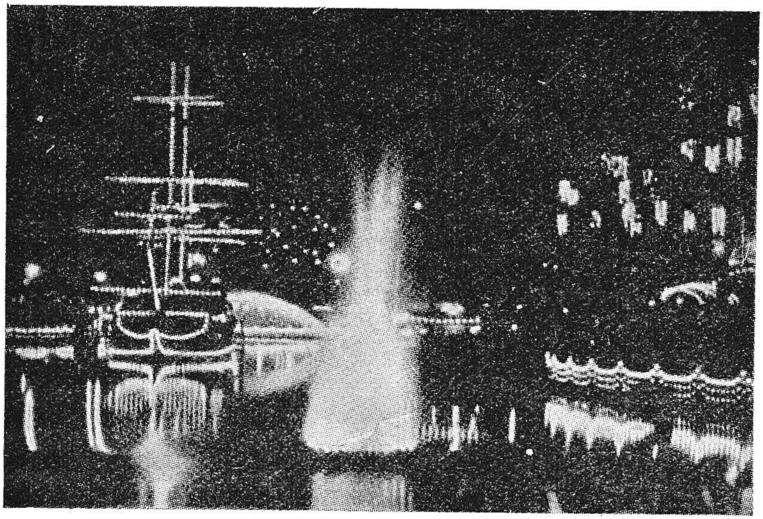

আলোর মালা পরে আছে প্রদর্শনী।

প্রাসাদশিখরের এক প্রান্তে ট্রান্সমিটার এরিয়াল যেন শিখায়িত হয়ে পৃথিবীর আকাশকে আহ্বান জানাচ্ছে। এই এরিয়াল থেকেই ব্যাপ্ত হয়—ছড়িয়ে পড়ে জগতের প্রতিটি আনাচে-কানাচে—বি-বি-সি হোম সার্ভিসের উদ্দৃপ্ত ঘোষণা, কুইনস্ গভর্নমেণ্টের বাণী, গ্রেট বৃটেনের সিংহগর্জন।

প্রাসাদ-অন্তঃপুর থেকে মেশিনের ঘর্ঘর, গম্ভীর গর্জন অবিরত শোনা যায়। ওখান থেকে একটু পাশ ফিরতেই আর এক দৃশ্য। আলেকজেন্দ্রা পার্কে কার্নিভেল সুরু হয়েছে। আলোর মালা পরে আছে প্রদর্শনী। মদের দোকানে ভিড়ের অন্ত নেই। অদূরে ডায়নামো চলেছে ঘর্ঘর শব্দে। আর সেই ফান-ফেয়ার। জুয়ার সুসভ্য সংস্করণ। নানা রকমের কাপ ডিস খেলনা। মায়, গোটা গোটা নারকেল পর্যন্ত। বাজিতে জিততে পারলে তোমার হবে। না পারলে—তোমার তাতে অধিকার নেই। একটা মেয়ে মাইক সহযোগে সেই খেলায় যোগদান করতে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে। গমগম করে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার সেই ঘোষণা। দর্শকবৃন্দ হাঁ করে শুনছে।

আর একদিকে খেলাঘরের ঘোড়ার ওপর ছেলেদের ভিড়। ঘোড়া উঁচু হয়ে—নিচু হয়ে ঘুরছে। আর সেইটেই কত উপভোগ্য ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে।

অদূরে হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে কৃত্রিম দ্বীপ। সেই হ্রদের জলে মোটরলঞ্চ চড়লাম। প্রত্যেকের টিকিট হচ্ছে ছ-পেনি। যে ছোকরাটি পয়সা নিচ্ছে তার পরনে শুধু ফুল প্যাণ্ট। গায়ে জামা নেই। ইংলণ্ডে এই অগস্ট মাসে এত শীত যে আমাদের পক্ষে ধুতি চলে না। অথচ ছেলেটির কাছে এটা নাকি গ্রীষ্মকাল। তাই জামা পরবার তার দরকার করেনি। না জানি, এরা আমাদের সত্যিকার গরম দেশে এলে কি করবে!

একটা ইঞ্জিন দেওয়া ট্রেনে চড়লাম। প্রতিটি কামরায় দুটি মাত্র লোক সামনের দিকে মুখ করে এক সঙ্গে বসতে পারে। মাথায় ছাদ নেই। ছাদ হচ্ছে আকাশ। ছোট রেলের মতো ট্রেনের গড়ন। লাইনও ছোট রেলের চেয়ে ঘন। তাতে চড়তেও ছ-পেনির টিকিট। ট্রেন শুধু হ্রদটি প্রদক্ষিণ করে এল। এতেই আনন্দ। ট্রেনের নাম ছোট ইঞ্জিনের গায়ে খোদাই করা: ডিউক অব এডিনবার্গ।

ফেরার পথে দেখলাম রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলিকে। ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। রাত তখন নটা। এদিকের আলোগুলি এমনি ভাবে তৈরি যে সাদা দেখায় না। দেখায় লাল। সমস্ত মফঃস্বলের আলোও এই ধরনের।

ড্রুম্যাণ্ড স্ট্রীটের একটা হোটেলে ঢুকলাম ডিনার সারতে। ও-অঞ্চলে ভারতীয় হোটেল বলতে ঐটিই। রাস্তাটা গাওয়ার স্ট্রীটের পাশেই।

পেলাম গরম ভাত, ডাল, মাংস ও হাতে গড়া রুটি।

একটি যুবক নীরবে সার্ভ করে যাচ্ছিল। পরনে সাদা কোট, কালো প্যাণ্ট। তার ভদ্রতা ও সুকোমল ব্যবহার শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারল না। যুবকটির গায়ের রঙ পরিষ্কার। মুখশ্রী সুন্দর। ডেকে আলাপ করলাম: মাপ করবেন। আপনি কি বাঙালী?

—হ্যাঁ।

—কোথা থেকে এসেছেন ?

—কলকাতা থেকে।

—কলকাতার কোন্ জায়গা থেকে ?

—খিদিরপুর।

—এখানে কি চাকরি করেন ?

—ঠিক চাকরি নয়। পড়ার খরচ জোগাতে এ-হোটেলে পার্ট-টাইমে কাজ করি—সন্ধ্যাবেলা।

—কী পড়েন ?

এম-এ, ল' পাস করে এখানে এসেছি ব্যারিস্টারি পড়তে। পাস যদি করতে পারি, দু'বছর বাদে দেশে ফিরব।

—দেশে কে আছেন ?

—মা আছেন, বাবা আছেন আর দুই বোন।

—বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে ?

—না না। তারা এখন ছোট। দেশে ফিরলে আদালতে যদি পশার হয়, তবেই তাদের বড় ঘরে বিয়ে দেওয়া সম্ভব। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। বাবা চাকরি করতেন, হঠাৎ সেদিন চিঠি পেলাম, চাকরি তাঁর দ্বারা আর সম্ভব হবে না। পক্ষাঘাতে দেহের একটা অঙ্গ পড়ে গেছে।

কী ভয়ানক ব্যাপার! বার বার কথাটা মনে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, আদালতে যদি পশার হয় তবেই তাদের বড় ঘরে বিয়ে দেওয়া সম্ভব-।

আর যদি না হয়! ভাবতে গিয়ে কণ্ঠনালীতে রুটির খানিকটা টুকরো আটকে গেল। বিষম খেলাম।

যুবক ব্যস্ত হয়ে বললে, জল খান। একি, জল যে ফুরিয়ে গেছে!

চট করে সে কাচের জগটা আনতেই যেন সরে গেল।

এর পরও যুবকটির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

দেখা থেকে অন্তরঙ্গতা। কতদিন তার ঘরে গেছি। ফিন্‌লে রোডের এক ল্যাণ্ডলেডির বাসায় সে থাকত। সে আমাকে তার মায়ের লেখা চিঠিগুলি দেখাত। মা খুব শিক্ষিত নন। আধুনিক জগতের মহিলার মতো তাঁর লেখায়ও দেখিনি মুন্সীয়ানা। তবু মা—মা-ই। কত উপদেশবাক্য—কত সান্ত্বনায় তাঁর সে সব চিঠিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ।—বাবা, ঈশ্বরের কাছে অনবরতই প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো, তুমি বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো। আমাদের অবস্থার কথা তোমায় ভাবতে হবে না···তুমি ছাড়া যে বাবা, আমাদের গতি নেই! কবে তোমার সেই সোনা-

মুখখানি দেখব—তারই আশায় বেঁচে আছি। কতদিন তোমায় দেখিনি···সাবধানে থেকো, ইত্যাদি.ইত্যাদি।

দেশে ফেরবার তিন-চারদিন আগে আবিষ্কার করলাম, আমার টাকা যেন কিছু কম পড়ছে। সেকথা কেমন করে যে যুবকটি জানতে পেরেছিল, জানি না। সহসা দেখা করে দশ পাউণ্ডের দশখানি নোট দিতে এল। তখন তার পরীক্ষা সুরু হতে কয়েকদিন মাত্র বাকী। পড়ার জন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল।

তার টাকা কেমন করে নিতে পারি? টাকার যে তার এখন অনেক দরকার। তাকেই তো সাহায্য করা আমার উচিত!

মিথ্যে করে বলেছিলাম, টাকা আমি পেয়ে গেছি।

—তা' হোক, তবু নাও।

—ধার?

—ধার বলে আমি কাউকে দেই না। এতে ঝগড়া হয়। এটা তোমার।

—তারপর? তোমার কেমন করে চলবে?

—সময় পেলে পোর্টারের কাজ করব।

পোর্টারের কাজ মানে স্টেশনের কুলিগিরি। সেকথা ভাবতে গিয়েও চোখে জল এসেছিল। আমার জন্যে একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক রিক্তহস্তে বিদেশে কুলিগিরি করবে?

সে টাকা নিতে পারিনি।

চলে আসবার কালে বার বার সেই যুবকটির অভিমানক্ষুণ্ণ- মুখখানি মনে পড়ছিল। বার বার তাকে নমস্কার জানিয়েছি। তার স্বাবলম্বী পুরুষকারকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। তার উদ্দেশ্যে গোপনে কত শতবার অন্তরের শুভকামনা বর্ষণ করেছি!

বিকেলে প্রশান্তের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম।

প্রশান্ত আমার বাল্যবন্ধু। আগে থাকত শ্যামবাজারে। বছর পাঁচেক হল উঠে এসেছে নিজেদের নূতন বাড়িতে। প্রশান্তর বাবার বিরাট বইয়ের দোকান। প্রশান্ত শেয়ার বাজারে ফাটকা ধরে। যদি একখানা বই ছাপিয়ে দেয়—তারই সূত্র ধরে তার কাছে যাওয়া।

এ বাড়িতে এর আগে আর আসিনি। কত নম্বর হেমচন্দ্র স্ট্রীট যেন। কলকাতা—২৩।

বাড়ির অপর অংশে থাকেন এক ভাড়াটিয়া।

সেখানে কান্নাকাটির যেন তুফান বয়ে যাচ্ছে।

একটি মহিলা মাটিতে পড়ে আছাড়ি-পাছাড়ি করছেন।

তাঁর স্বামীটি রোগে জরাজীর্ণ। হাসিকান্না—দুইই তাঁর কাছে সমান।

দুটি ছোট ছোট মেয়ে এখনো বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি। যখন পারবে, কী করবে কে জানে! প্রশান্তর মনও চঞ্চল।

তাঁর মুখ থেকেই ব্যাপারটা শুনলাম।—অসুস্থ ভদ্রলোকের একটি ছেলে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ছিল। পাস করে গেছে। আগামী মাসে ফিরবে—জাহাজ বুক করা হয়েছে, চিঠি পেয়েছিলেন। আজ সকালে অকস্মাৎ এক টেলিগ্রাফ এসে হাজির, ছেলে নেই। মার্বেল আর্চের কাছে মোটর-দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে নিহত।

প্রশান্তর ড্রয়ার থেকে একটা ফটো বেরুলো।

চোখের সামনে মেলে ধরতেই যেন আঁতকে উঠলাম।

তিন বছর আগে লণ্ডনের ড্রুম্যাণ্ড স্ট্রীটের সেই হোটেলে আমার প্রথম পদক্ষেপ। তার আঠারো মাস পরে কলকাতায় ফিরে আসি। জীবনে সত্যিকার বন্ধুবিচ্ছেদ কী—জানতাম না। আজ প্রথম সেটা অনুভব করলাম!

সমস্ত লণ্ডন শহরটাই মোটরের বিরাট এক কবন্ধ চাকায় যেন তালগোল পাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত জরুরী কয়েকটা কাজ ছিল। হল না।

রোগ মুক্ত করো

সামান্য চেষ্টার ফলে যে, মানুষ কত বড় ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারে, শ্রীমান্ দীপ্তিই তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। মাত্র দু' বছর নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে সে এমন সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে! এবারে বর্ধমান বিভাগে স্বাস্থ্য -প্রতিযোগিতায় বড়দের বিভাগে সে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। একটু চেষ্টা করলেই তোমরাও এমনি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পার।

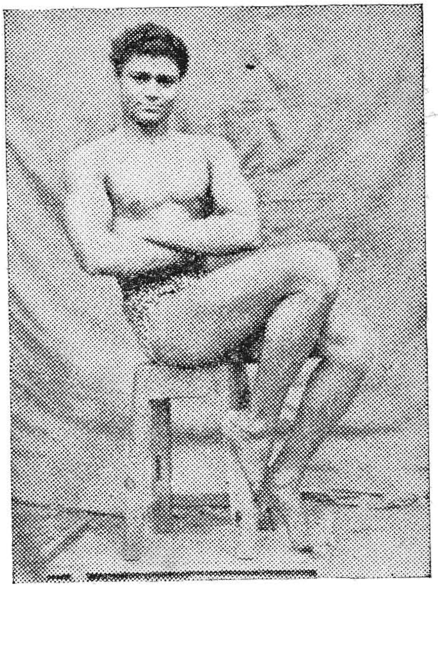

সিদ্ধেশ্বর সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

আশীর্বাদ

—বীথি বিশ্বাস

স্কুলের কেরানীবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণা এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাচ্ছিল। নবমশ্রেণীর দরজায় দাঁড়িয়ে কেরানীবাবু প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ ঘোষকে ডাকলেন। তিনি তখন ওদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। বইটা টেবিলের ওপর রেখে সামনে এসে কেরানীবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটি ভর্তি হতে এসেছে বুঝি?" পরক্ষণেই কৃষ্ণার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, "কোন ক্লাসে ভর্তি হতে এসেছ? কোন স্কুলে এর আগে পড়তে?"

কৃষ্ণা শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি 'রানী ভবানী গার্লস্ স্কুলে' পড়তাম। সেখানে ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠেছি। বাবা অফিস-রুমে বসে আছেন; তাঁর কাছে আমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট রয়েছে।"

মিস্ ঘোষ দু'মিনিট কি যেন চিন্তা করলেন, পরে বললেন, "তুমি ক্লাসের মধ্যে এস। নরেনবাবু, আপনি অফিস-রুমে যান, আমি মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখছি।"

'বালিকা বিদ্যাভবনে'র প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ রমলা ঘোষ স্কুলে কড়া নিয়ম প্রচলন করেছেন। অন্য স্কুল হতে ভাল নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে এলেও তাকে বিনা পরীক্ষায় ভর্তি করেন না। ইংরেজী, অঙ্ক, সংস্কৃত—অন্ততঃ এই তিনটির পরীক্ষা নেবেনই। ইংরেজীটা তিনি নিজেই পরীক্ষা করেন।

কৃষ্ণাকে ডেকে নিয়ে ক্লাসের মধ্যে আবার চেয়ারে বসলেন। তারপর নবমশ্রেণীর ইংরেজী গদ্যের বইখানি খুলে একটি গল্প ওকে পড়তে বললেন। কৃষ্ণার ইংরেজী উচ্চারণে মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাশভারী শিক্ষয়িত্রী মিস্ ঘোষ। বারো বছর বয়স কৃষ্ণার। এরই মধ্যে সে নবম শ্রেণীতে পড়ছে, তার উপর এমন সুন্দর ইংরেজী-জ্ঞান—জিনিয়াস! প্রশংসার দু'একটি মিষ্টি কথাও বললেন কড়া মেজাজের মিস্ ঘোষ, "বাঃ, সুন্দর পড়েছ ত'? তোমার নাম কি?" "কৃষ্ণা"—কৃষ্ণার উত্তর ধ্বনিত হল সমস্ত কক্ষে। মিস্ ঘোষ ওকে নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটি লোষ্ট্রনিক্ষিপ্ত মৌচাকের মৌমাছির মত গুঞ্জন করতে লাগল।

মিস্ ঘোষের পেছনে যেতে যেতে দু'একটি কথাও কানে গেলো, "মেয়েটা আমাদের ক্লাসে ভর্তি হবে।" "এত ছোট বয়সে কি সুন্দর ইংরেজী পড়তে পারে।" "রমলাদি' ত' মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এখন থেকে ও-ই সর্বোচ্চ নম্বর পাবে।" এ ছাড়াও আরও কয়েকটি মন্তব্য শুনতে পাওরা গেল—"কিন্তু গায়ের রঙটি বেশ সুন্দর।" "রাতের অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারবে না ওর অস্তিত্ব।" "ওই কালো পেত্নীর মত রংয়ে আবার হলদে ফ্রক পরেছে, ও ভেবেছে বোধহয় ওটাতে ওকে খুব মানাচ্ছে।"

আর কিছু শুনতে পেল না কৃষ্ণা। কিন্তু সমবেত কণ্ঠের হাসির শব্দ অফিস-রুমে বসেও যেন শুনতে পাচ্ছিল্ল। হতাশায়, ক্ষোভে ওর মুখখানা আরও ম্লান হয়ে গেল। ওর মনে পড়ল পূর্বের স্কুলের কথা। সেখানেও মেয়েরা ওর কালো রং নিয়ে প্রথমে আড়ালে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়ত না। তবে ওর মিষ্টি ব্যবহারে ও পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করার দরুন ও স্কুলের সবারই প্রিয়পাত্রী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কাল হলেন নবাগতা শিক্ষয়িত্রী মিস্ সোম। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে ওখানে মেয়েরা নানারকম উৎসব করত। এই উৎসবেই মেতে উঠেছিল কৃষ্ণা। লাইব্রেরী-রুমের বারান্দা দিয়ে কতকগুলি ফুল নিয়ে ও আসছিল। নিজের নামটা শুনতে পেয়ে সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মিস্ সোমের কণ্ঠস্বর, "ক্লাস এইটের ওই যে মেয়েটি, কৃষ্ণা না কি যেন নাম, ও কেন 'বিউটি-কনটেস্টে' নামে না। বেশ হয় কিন্তু!" হি-হি করে হেসে উঠলেন তিনি। কৃষ্ণা আর দাঁড়াতে পারে নি, মেয়েদের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে বাড়িতে ছুটে এসে মায়ের কাছে কেঁদে ফেলেছিল।

ওর মা-উজ্জ্বলাদেবী সমস্ত কথা শুনে রেগে আগুন। তিনি তক্ষুনি কৃষ্ণার বাবা মহীমবাবুকে বললেন, যে স্কুলে তাঁর মেয়েকে কালো বলা হয়েছে, সেখানে ওকে আর পড়াবেন না। মায়ের কথা শুনে অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল কৃষ্ণা। ওর মাকে দেখতে খুবই সুন্দরী। ছোটবেলায় কৃষ্ণাকে ডাকতেন 'কালীতারা' বলে। ওর নাম নীলিমা, হেনা, অনুরাধা না রেখে 'কৃষ্ণা' রেখেছিলেন। মামাবাড়িতে ওকে সবাই 'কালীতারা' বলেই ডাকে। কিন্তু গতবছর থেকে ওর মায়ের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে ও। তিনি এখন ওকে 'কালী' না ডেকে 'কৃষ্ণা' নামেই ডাকেন। গতবারের বড়দিনের ছুটিতে মামা এসেছিলেন। তিনি চিরদিনের অভ্যাস অনুসারে 'কালী' বলে ডাকাতে মা তাঁর উপর ভয়ানক চটে গেলেন। সেই থেকে তিনি আর মামাবাড়িতে যান নি, কৃষ্ণাকেও পাঠান নি।

বাবার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল কৃষ্ণা। এতক্ষণ ও অতীতের স্মৃতিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। "তা'হলে আপনার স্কুলেই ও'কে ভর্তি করে দিচ্ছি, ওর মায়ের ইচ্ছে।"

"নিশ্চয়ই, সবকটা অঙ্ক শুদ্ধ হয়েছে, ইংরেজী-জ্ঞানও যথেষ্ট।" মিস্ ঘোষ প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। অঙ্কের শিক্ষয়িত্রী মিস্ মিত্রও সমর্থন জানালেন।

কৃষ্ণা নবম শ্রেণীতে ভর্তি হল।

তিন মাস পর, কৃষ্ণাদের স্কুলে 'সেক্সপীয়রে'র বিখ্যাত নাটক 'মার্চেন্ট অব ভিনিশ'-এর অভিনয় হবে। শিক্ষয়িত্রীগণ সমস্ত স্কুল থেকে উপযুক্ত মেয়ে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। কৃষ্ণার কথা প্রত্যেকেরই মনে হল। ওর মত ইংরেজী উচ্চারণ কেউ করতে পারে না—এমন স্পষ্ট, এমন শুদ্ধ ও এমন সুন্দর! ওর ইচ্ছে 'পোর্সিয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করবার। পোর্সিয়ার পার্ট ওর কণ্ঠস্থ। কোনটাই বা নয়? সমস্ত বইখানিই ওর প্রায় মুখস্থ। কিন্তু মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখতে হয়। প্রকাশ করবার সাহস নেই!

শিক্ষয়িত্রীরা শেষ পর্যন্ত ওকে অভিনয় করা থেকে বঞ্চিতই করলেন। তিনবার প্রসাধনের পলাস্তারা লাগালেও ওর ত্বকের একটুও পরিষ্কার হবার সম্ভাবনা নেই। তবে অভিনয় শেখাবার ভার ওর ওপরেই পড়ল।

অভিনয়ের দিন সন্ধ্যাবেলা। 'বালিকা বিদ্যাভবনে'র প্রবেশ-দ্বারের সামনে কৃষ্ণা দাঁড়িয়েছিল। লেখা, চিত্রা, অণিমারা অভিনয় করবার জন্যে সাজ-সজ্জা করছে। এখনও অভিনয়ের বিলম্ব আছে। ওকে 'প্রম্পট্' করতে হবে, তাই ওর সজ্জার দরকার নেই।

ওর মন খুবই বিমর্ষ, মুখখানি ম্লান। আজ মাননীয় অতিথিরা আসবেন। তাঁদের হাততালিতে মুখরিত হবে প্রেক্ষাগৃহ। চিত্রা, সিক্তা, মল্লিকারা নিজেদের অভিনয় দক্ষতায় দর্শকের প্রশংসা লাভ করবে। কিন্তু ওদের চেয়ে ভাল অভিনয়-দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র কালো রংয়ের জন্যে ও হয়ে থাকবে সকলের অপরিচিতা। একে বিধাতার তীব্র অভিশাপ ছাড়া আর কি বলবে ও! কয়েকবিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর কপোলে।

কিন্তু সেইক্ষণেই চোখ মুছে ও তাকাল। স্কুলের গেটে একটি মোটর থেমেছে। তার মধ্যে হতে ওর সমবয়স্কা একটি সুশ্রী মেয়েকে হাত ধরে নামালেন একজন মহিলা—বোধ হচ্ছে ওর মা। পেছনে তানপুরা, তবলা নিয়ে আরও দু'জন ব্যক্তি। মেয়েটি আজ ওদের ফাংসানে গান গাইবে।

অকস্মাৎ বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল কৃষ্ণা, মেয়েটি অন্ধ! করুণায় ওর হৃদয় গলে গেল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরল। এর আগে কোনদিন ও অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে এত দ্বিধাহীন ভাবে ভাব করতে অগ্রসর হয় নি—বিশেষতঃ সুশ্রী, সুন্দরী মেয়েদের কাছে। আজ কিন্তু দ্বিধামুক্ত ও। "তোমার নাম কি ভাই?" স্কুলের হলঘরের দিকে যেতে যেতে কৃষ্ণা মিষ্টিকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

উপযুক্ত মেয়ে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। [পৃঃ ৬৬

আন্দাজে ওর দিকে মুখটা ঘুরিয়ে মেয়েটি বলল, "অঞ্জনা। তোমার নাম কি ভাই? খুব ভাল মেয়ে তুমি। কেমন হাত ধরে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ।"

কৃষ্ণা হেসে উত্তর দিল, "আমার নাম কৃষ্ণা। আমি এই স্কুলেরই নবম শ্রেণীর ছাত্রী।" একটু হেসে আবার বলল, "তুমি ত' আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, তাই আমার প্রশংসা করলে। দেখতে পেলে

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে।" হাসি সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা ওর কণ্ঠে ফুটে বেরোল। অন্ধের অনুভূতি-শক্তি প্রবল। ভাই কৃষ্ণার হাতটা জোরে চেপে ধরে অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল, "একথা কেন বলছ ভাই ?"

"তোমাকে দেখতে কত সুন্দর, আর আমি কালো।" কৃষ্ণাকে বাধা দিয়ে অঞ্জনা বলে উঠল, "কিন্তু ভাই আমার মত দুঃখী আর কেউ নেই, অপরের সাহায্য ছাড়া একপা চলতে পারি না! আমি এমন অভিশপ্ত যে, এই সুন্দর পৃথিবীকে দেখে নিজের জন্মকে সার্থক মনে করতে পারছি না।" বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ থেকে। কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে মুছিয়ে দিল। কিন্তু মনটা অঞ্জনার জন্যে ব্যথিত হয়ে উঠল। এমন সময়ে ওর মা এসে অঞ্জনার হাত ধরলেন। তিনি এতক্ষণ ড্রাইভারকে কি যেন বলছিলেন। "এস অঞ্জু, ওদিকে মিস্ ঘোষের সঙ্গে আগে দেখা করে আসি।" কৃষ্ণাকে তিনি কিছুই বললেন না। কিন্তু ঘৃণায় কি ওঁর মুখটা কুঞ্চিত হয়েছিল, এই কালো কুৎসিত মেয়েটা তাঁর সুন্দর মেয়েকে ধরেছিল বলে ?

কিন্তু কৃষ্ণা তা' আজ আর লক্ষ্য করল না। ওর মনের মধ্যকার এতদিনের সমস্ত গ্লানি যেন এক লহমায় দূর হয়ে গেল। প্রণিপাত করল ও মহামহিমময়ের উদ্দেশে, "আমি কালো, কিন্তু অঙ্গহীন ত' নই। অপরের সাহায্য না নিয়ে চলতে পারছি, এই ত' আমার প্রতি তোমার সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।"

সিদ্ধেশ্বর সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

একটি গল্পের ভূমিকা

—শ্রীদেবেশ পাল

পাশের ছোট্ট বাগানবাড়িটা অনেকদিন ধরেই ফাঁকা পড়েছিল, ও বাড়ির বাগানটাই ছিল আমার লুকিয়ে কবিতা লিখবার জায়গা। প্রায়ই ছুটির দিনে লাউ গাছের মাচাটার তলায় গিয়ে বসতাম, তারপরেই লিখতে আরম্ভ করতাম পাতার পর পাতা কবিতা।

সেদিনও ঠিক দুপুরবেলায় মাচার তলায় এসে বসেছি। মেঘশূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আবেগভরে সবে লিখতে সুরু করেছি। 'সুদূরে আকাশ মেঘমাখা……।' হঠাৎ পায়ের শব্দে চমক ভাঙল। তাকিয়ে দেখি, অদূরে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছেন। অথচ আমি একটুও খেয়াল করিনি, এমনই তখন আমার ভাব। ওনাকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভদ্রলোক একটু মুচকে হেসে পাশে এসে বসলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়েই রইলাম। অপূর্ব দেখতে। বয়স বোধ হয় সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। অথচ কি সুন্দর স্বাস্থ্য, রংটাও খুব পরিষ্কার। আর মুখে বেশ একটা শান্তসৌম্য ভাব, দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। জিজ্ঞেস করলেন—'কি লিখছো?' '—ও কিছু নয়', বলেই তাড়াতাড়ি খাতাটা বন্ধ করে দিলাম। পাছে আবার দেখতে চান সেই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে বসলাম—'আপনাকে ত' ঠিক চিনতে পারছি না! এ বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছেন বুঝি?'

উনি আবার ওনার সেই আদি ও অকৃত্রিম হাসি হেসে বল্লেন—'ভাড়াটে নয়, এ বাড়ির মালিক হয়েই এসেছি।'

—'ও আপনি এ বাড়িটা কিনেছেন তাহলে।'

—'হ্যাঁ, রিটায়ার করেছি। একলা মানুষ, তাই এ ছোট্ট বাড়িটাই কিনলাম।'

ভদ্রলোক বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি ঐ খাতায় কাব্যচর্চা করে চলেছি। কেননা এ রকম শান্ত পরিবেশে কেউ আর অঙ্ক কষে না। তার জন্যে বাড়ির পড়ার ঘরই আছে। তাই আবার প্রশ্ন করলেন।

—'আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবে না ত' ?'

—'মনে করবার কি আছে, যা' বলবেন বলুন না।'

—'সত্যি করে বল ত' তুমি ঐ খাতায় কি লিখছিলে।'

এবার আর মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না। ওনার এই সরল প্রশ্নে ততোধিক সরল চাহনিতে বাধ্য হয়েই বলতে হল—'কবিতা লিখছিলাম।'

—'তা' বুঝতে পেরেছি, তা' তুমি কি শুধু কবিতাই লেখ না গল্পও লিখতে পার ?'

—'বা গল্প লিখতে পারি বই কি। ভাল প্লট পেলে তক্ষুনি লিখে ফেলি।'

কথাটা শোনা মাত্রই ওনার চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হল এই কথাটা শোনবার জন্যেই যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। সাগ্রহে বলে উঠলেন—'পার লিখতে ? আমি যদি একটা ছোট্ট ঘটনা বলে যাই তবে তাকে গল্পের আকারে রূপায়িত করতে পারবে ?'

এবার একটু নম্র হয়ে বল্লাম—'চেষ্টা করলে পারব না কেন। মনে হয়ত পারব, আপনি বলুন না।'

—'আচ্ছা বলছি তা'হলে শোন। আমি তখন সবে নদীয়ার ডি. এম. হয়ে এসেছি। সব অফিসারদের সাথে ভালভাবে পরিচয়ও হয়নি। সারাদিন কাজেই কেটে যায়। একদিন রাত তখন ন'টা। খাওয়া-দাওয়ার পর সবে শুয়েছি। হঠাৎ ফোন এল, তক্ষুনি যেতে হবে রানাঘাট। ওখানকার কুপার্স ক্যাম্পে ভীষণ গোলমাল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রিফিউজিদের প্রায় হাজার দশেক টাকা আত্মসাৎ করে দিয়েছে। আগেও নাকি দু'একবার এরকম করেছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ধরা যায়নি। এবার একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ ছুটলাম জীপ্ নিয়ে। পুলিস নিয়ে গিয়ে বাড়ি চড়াও করলাম, কিন্তু অ্যারেস্ট করতে গিয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম, বুঝিবা ক্ষণিকের জন্যে একটু আনমনাও হয়ে গেছলাম। কিন্তু নিজের দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠলাম—সরকারের টাকা তছনছ করার জন্যে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।

তারপর পুলিস সুপারের হাতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সমর্পণ করে রাত প্রায় বারোটার সময় বাংলোয় ফিরে এলাম। ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আর আসছিল না। কেবলই মনের মাঝে নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। আশ্চর্য ! দুনিয়ায় কত রকমের মানুষই না আছে। তাদের দ্বারা কিনা সম্ভব ? কি করে পারল এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উদ্বাস্তুদের টাকা আত্মসাৎ করতে ? উচ্চশিক্ষিত লোক, একটু বিবেকেও বাধল না ! যদিও টাকার অঙ্কটা কম নয়, তা' বলে তার জন্যে এত বড় হীনতা ! এই উদ্বাস্তুরা যারা কিনা সর্বস্বান্ত হয়ে দেশের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে চলে

এসেছে, তাদের এই ক'টা টাকাই সম্বল। এই টাকা দিয়েই তারা আবার নতুন করে জীবন সুরু করবে। এই সব ভাবতে ভাবতে ছাত্রজীবনের ছোট একটা ঘটনা মানসপটে ভেসে উঠল।

অভিজাত পরিবারের ছেলে। নাম পীযূষ চ্যাটার্জী। সুন্দর তার চেহারা। ওর ঐ চেহারার জন্যেই আমার ওকে বড্ড ভাল লাগত। ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে পীযূষই ছিল আমার সবচেয়ে আপনার। এই নিয়ে আমার অন্যান্য বন্ধুরা বিরূপ মন্তব্য করতে ছাড়ত না। যদিও আমি তাতে কোনদিন কান দিতাম না, কিন্তু আমাদের এই বন্ধুত্বের বাঁধন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে উঠেই শিথিল হয়ে গেল।

সবে তখন কলেজে ঢুকেছি। নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা। নিজেকে জাহির করবার জন্যে সর্বদাই ব্যস্ত। থিয়েটার, ফাংসান সবতাতেই যোগ দিয়ে পরমানন্দে মেতে চলেছি। এল কলেজ-ইলেক্শন। আমি আর পীযূষ ঠিক করলাম দু'জনেই দাঁড়াব ক্লাস রিপ্রেজেণ্টেটিভ পদের জন্যে। দু'টো নমিনেশন লেটার লিখে পীযূষের হাতে দিয়ে বল্লাম—যা প্রফেসর দত্তকে দিয়ে আয়। উনিই ত' ইলেক্শনের হর্তাকর্তা।

নির্দিষ্ট দিনে ইলেক্শন আরম্ভ হল। চারিদিকে হুলুস্থুল, কে জেতে কে হারে, যেন জেনারেল ইলেক্শন হচ্ছে। এক কোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোর ক্যান্‌ভাসিং করে চলেছি। হঠাৎ দেখি আমারই এক ক্লাসফ্রেণ্ড ছুটতে ছুটতে আসছে। বল্লাম—কি ব্যাপার ?

ও হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল—ব্যাপার আর কি, সব মাটি হয়ে গেল, তুই নমিনেশন পাসনি।

—নমিনেশন পাইনি ! বলিস কি রে ! এ যে ল্যাণ্ডিংএ এয়ারক্র্যাশ্। সত্যি বলছিস ত' ?

—সত্যি নয় ত' কি ! জিজ্ঞেস কর না আর সবাইকে। তুই পাসনি অথচ পীযূষ পেয়েছে।

শুনে অবাক হয়ে গেলাম। নেতাজী ফিরে এসেছেন শুনলেও বোধ হয় এত অবাক হতাম না। ভাবলাম কি করে এ সম্ভব ! তবে কি নমিনেশন লেটার লিখতে কোন ভুল হয়েছিল ? তা'হলে ত' পীযূষও নমিনেশন পাবে না। আমিই ত' দুটো লেটার লিখেছিলাম।

বন্ধুটি বলে উঠল—নিশ্চয় পীযূষ তোর লেটারটা দেয়নি।

রেগে গেলাম—কি সব বাজে বকছিস। কখনও তা' হতে পারে না।

—তা' কি করে হবে বল ? ও তোর 'পরাণপ্রিয়' কিনা, তুই ভাবিস সবাই তোর মত ! ওকে ত' চিনিস না একেবারে খাঁটি মাকাল ফল। আরে দেখলি না আজ একবারও তোর সাথে দেখা করল না।

কথাটা মনে লাগল। ভাবলাম—হতেও পারে, এ জগতে কি না সম্ভব।

বন্ধুটি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্ল—চল্ প্রফেসর দত্তকে জিজ্ঞেস করে আসি, ওনার কাছেই সব জানা যাবে।

প্রফেসর দত্তকে বলায় উনি বল্লেন—আমি ত' তোমার নমিনেশন লেটার পাইনি।

—পীযূষ আপনাকে দেয়নি সার ?

—না তো, ও তো শুধু ওরটাই দিল। আচ্ছা পীযূষকে ডাক ত' একবার।

ডাকা হল ওকে। আশ্চর্য ! আমার দিকে একবারও তাকাল না। ভাবটা এমন আমাকে যেন চেনেই না। স্পষ্ট প্রফেসর দত্তের মুখের উপর নির্লজ্জভাবে বলে দিল—না সার আপনাকে দিইনি।

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভাবলাম—কি করে এ সম্ভব ? সামান্য কলেজ

ইলেক্‌শনে জিতবার জন্যে ও এত বড় ট্রেচারী করতে পারল ! এ বয়সেই যারা এ রকম, বড় হলে তারা কি না করতে পারে ! এর পর আর পীযূষের সাথে কোনদিন কথা বলার প্রবৃত্তি হয়নি। অনেকেই আমায় বল্ল—তুমি একেবারে বোকা। নমিনেশন লেটার কেউ কি কোনদিন অন্যের হাত দিয়ে পাঠায় ?

ভাবলাম সত্যিই তাই। আমিই বোকা। পীযূষের মত ছেলেরাই চালাক। জীবনের ইলেক্‌শনে ওরাই হবে জয়ী। আমাদেরই হবে পরাজয়।

এরপর বহু বছর কেটে গেল। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। অন্য সবার সাথে পীযূষও আমার স্মৃতিপট থেকে মুছে গেল। কেবল মুছল না কলেজ-জীবনের সুরুতেই যে কাঁটা বুকে বিঁধেছিল তারি ক্ষতের দাগটা।

সেদিন আবার বহু বছর পর পুরোনো ক্ষতটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সারা বুকটা ব্যথায় মুচড়িয়ে গেল। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেছলাম। চিনতে একটুকুও ভুল করিনি। এ যে আমাদেরই সেই পীযূষ……'

এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক দূর আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। চোখের কোলটা আপনা হতেই ভিজে গিয়েছে। আমি আর বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারলাম না। ধীরে ধীরে খাতাটা গুটিয়ে চলে এলাম।

কলিকাতার খিদিরপুর নিবাসী **অন্নপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়** আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"মুক্তকেশী সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে এক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ঃ

যে কোন বিষয়বস্তু নিয়ে একটি গল্প বা নাটিকা

১। শুকতারার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন। ২। ফাল্গুন-সংক্রান্তি পর্যন্ত রচনা গৃহীত হবে। ৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা "শুকতারা" বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ৪। শুকতারা কর্তৃপক্ষের বিচারই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। রচনার গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৫৲ টাকা দামের বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৩৲ টাকা দামের বই।

সোনার বাংলা

—শ্রীমধুসূদন মজুমদার

সুজলা সুফলা কাননকুন্তলা বঙ্গজননি, তোমায় প্রণাম করি।

"শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগরঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে ব্রহ্মপুত্র যমুনা মেঘনা পদ্মা গঙ্গা,"—

দুই প্রান্তে দুই মহান্ প্রহরী! অভ্রভেদী হিমাচল আর কল্লোলিত জলধি! পাহাড় থেকে নেমেছে কুজ্ঝটিকা, সাগর থেকে উঠেছে মেঘ! নিবিড় আঁধারে আড়াল করেছে বাংলার বুকে ভাঙাগড়ার খেলা!

সেই তিমির-যবনিকার উপর দিয়ে যুগে যুগে চমকে যায় ক্ষণিকের বিজলী-স্ফুরণ! উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মহাকালস্রোতের এক একটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ!

কতো-কতো হাজার বছর আগে!

এক আর্যেতর মহাজাতি! অস্ট্রলয়েড নিগ্রোবটু কত-কী বংশধারার সংমিশ্রণে তার উদ্ভব! ভাববিলাসে তন্দ্রালু; বাস্তবৃক্ষে কান্তারে পর্বতে সর্বত্র দেখে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রকাশ, পূজা করে সর্পকুম্ভীর মারীরূপিণী মারণ-শক্তির! কৌমতন্ত্রের আশ্রয়ে গ'ড়ে তোলে গ্রামীণ কৃষ্টি!

"বক্ষে তাদের বাত্যার সাহস, বাহুতে তাদের বজ্রের শক্তি!" মল্লযুদ্ধ করে বাঘের সঙ্গে, তালের ডোঙায় পারাপার করে অথৈ দরিয়া!

ও কি শোনা যায়?

পশ্চিমপানে অসি-ঝন্ঝনা!

বিজয়-রথে উত্তর ভারত অতিক্রম করে আসে দীর্ঘদেহ গৌরকান্তি নর্ডিক জাতি!

বিহারের প্রান্তসীমায় এসে থেমে যায় তাদের অব্যাহত গতি। পদে পদে দুর্বার নদীস্রোত! পথচিহ্নহীন অরণ্যকান্তার! দস্যু-রাক্ষসের অশুচি দেশে প্রবেশ করতে দ্বিধা জাগে আর্যের অন্তরে!

তবু তারা আসে!

আসে দিগ্বিজয়ের নেশায়! আসে অযোধ্যানরেশ রঘুরাজের চতুরঙ্গ সেনা! আসেন ভীম, আসেন কর্ণ, আসেন দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ বাসুদেব!

কৃষ্ণ বাসুদেব? শক্তি-পরীক্ষায় তাঁকে আহ্বান করেন পৌণ্ড্র বাসুদেব! দুই বাসুদেবের সেই সংঘর্ষ—সে যেন কৃষ্টির সঙ্গে কৃষ্টির সংঘর্ষ! আর্যের অগ্রগতির সম্মুখে অনার্যের মৃত্যুপণ প্রতিরোধ!

১নং মল্লযুদ্ধ করে বাঘের সঙ্গে। ২নং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ৩নং বিজয় সিংহের সমুদ্রযাত্রা।

পৌণ্ড্রের পরাজয় কি নতশিরে সহ্য করেছিল বাঙ্গালী ?—

না !

এল কুরুক্ষেত্র! কৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডবের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী সেনা যুদ্ধ করল দুর্যোধনের স্বপক্ষে !

ভারতযুদ্ধের অবসানে উত্তর ভারতের ক্ষাত্রশক্তি যখন অবসাদে আচ্ছন্ন, চুপি চুপি ধীরে ধীরে বাংলার বুকে অনুপ্রবেশ করতে থাকল দলে দলে আর্য ব্রাহ্মণ !

বিশ্বামিত্র ঋষির পঞ্চাশ পুত্র, দীর্ঘতমসের পাঁচ! বাংলার কোণে কোণে আর্যসভ্যতার ঘাঁটি স্থাপন করল তারা।

কখনো মিলন, কখনো বিরোধ, কখনো শান্তি, কখনো যুদ্ধ—এরই ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল আর্য-অনার্যের একীকরণ !

আর্যের জিগীষা নবরূপ গ্রহণ করল অনার্যের প্রেরণা লাভ করে। সিংহপুরের রাজপুত্র বিজয় বেরিয়ে পড়ল সমুদ্রপারের নতুন দেশে সিংহাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে। লঙ্কা হল সিংহল।

এগিয়ে চলে বাংলার বুকে একীকরণ! গড়ে ওঠে গঙ্গাহৃদয়—গঙ্গা-তীরের বাঙ্গালী রাষ্ট্র। সুন্দরবনের সমুদ্রতীরে গঙ্গানগরে তার রাজধানী।

পাটলিপুত্রের সহযোগিতার বলে অপরাজেয় গঙ্গাহৃদয়।

বিশ্বজয়ের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতের বায়ুকোণে হানা দিলেন মাসিদনপতি আলেকজাণ্ডার। পরাজিত হলেন আর্যরাজ পুরু। গ্রীক ভাবল—ভারত এবার লুটিয়ে পড়বে তার পায়ের তলায়।

কিন্তু পুরু ছাড়া কি ভারতে আর বীর নেই ? পূর্বভারতের গঙ্গাতীরে তিন লক্ষ তরবারি যুগপৎ ঝলসে উঠল, দিগ্বিজয়ীকে অস্ত্রমুখে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে।

সেই তিন লক্ষ তরবারি পাটলিপুত্র-গঙ্গাহৃদয়ের যৌথ-বাহিনীর। দুঃসাহসী আলেকজাণ্ডারও তাদের আক্রমণ করতে সাহস করলেন না ; ফিরে গেল গ্রীসের দুর্মদ সেনাদল।

গঙ্গার তীরে গঙ্গাহৃদয় গড়িল বঙ্গবীর ;
স্থলে জলে তার দৃপ্ত কেতন উড়ে উন্নতশির !

[চলবে

খেলার আসর

—শ্রীসাংবাদিক

ডুরাণ্ড কাপ—এ বছরে ডুরাণ্ড কাপ লাভ করেছে হায়দরাবাদ পুলিস দল। এর আগে হায়দরাবাদ দল কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিংকে ৩-০ গোলে হারিয়ে রোভার্স কাপ লাভ করেছিল, আবার ডুরাণ্ড ফাইনালে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে ডুরাণ্ড কাপও লাভ করল।

হানিফ মহম্মদের রেকর্ড—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্রীজ টাউন মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তানের মধ্যে ছয়দিনব্যাপী প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ হয়ে গেল। খেলাটি আরম্ভ হয় ১৭ই জানুয়ারী। খেলাটির ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

এ খেলাটির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদের কথা বলতে হয়। তিনি অল্পের জন্যে লেন হাটনের ব্যক্তিগত রাণসংখ্যা (৩৬৪) ভাঙতে পারেননি বটে, তবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৩৩৭) করেন। লেন হাটন ছাড়া আর কেউ এত রাণ করতে পারেননি। তৃতীয় সর্বোচ্চ রাণ করেন ইংলণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে। তাঁর রাণসংখ্যা ছিল ৩৩৬। তারপরেই ডন ব্র্যাডমানের ৩৩৪ রাণ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই রাণ করেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে।

হানিফ মহম্মদ রাণসংখ্যায় রেকর্ড না করতে পারলেও উইকেটে বেশী সময় টিকে থাকার দিক থেকে রেকর্ড করেছেন। তিনি মোট ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট উইকেটে ছিলেন। এটা একটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। রাণসংখ্যায় রেকর্ড সৃষ্টিকারী লেন হাটন ৩৬৪ রাণ করার কালে ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট উইকেটে ছিলেন।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের ভারত সফরের সময় মাত্র ১৭ বছর বয়সে হানিফ মহম্মদ প্রথম টেস্ট খেলেন। হানিফ এ-যাবৎ মোট ১৯টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নামে। ৯ উইকেটে ৫৭৯ রাণ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট ছেড়ে দেয়। এই রাণসংখ্যার মধ্যে এভারটন উইকসের ১৯৭ রাণ এবং ও. সি. হাণ্টের ১৪০ রাণ উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তান শেষ দিনের আধ ঘণ্টা থাকতে আট উইকেটে ৬৫৭ রাণ করে ডিক্লেয়ার করে দেয়। এত রাণ পাকিস্তান আর কোন দেশের বিপক্ষে করতে পারেনি। খেলা শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট না হারিয়ে ২৮ রাণ করে।

শেষ পর্যন্ত খেলাটির ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট খেলোয়াড়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে পাকিস্তানের ১৬ বছর বয়সের নসিমল গণি বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হবার গৌরব অর্জন করেছেন। নসিমলের প্রকৃত বয়স ১৬ বছর ১৪৮ দিন, এর আগে পাকিস্তান দলেরই খালিদ হোসেন সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেছিলেন। সে-সময় হোসেনের বয়স ছিল ১৬ বছর ৩৫২ দিন।

উজল পাতা

ভাবের যখন বন্যা আসে,
থাকতে পারে কে ?
বাচ্চু এখন ভাবের মাতাল,
থামায় তারে কে ?

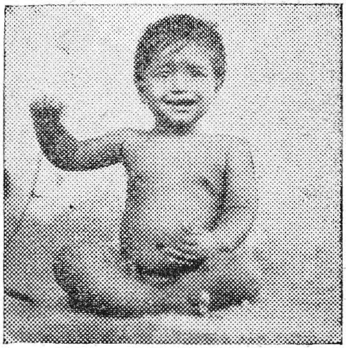

ফটো তুলেছেন ঃ—শিশিরকুমার সাউ
কুলটিকরী।

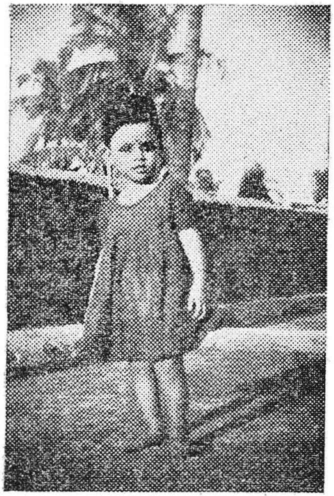

ফটো তুলেছেন ঃ—বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
তেলিনীপাড়া, হুগলী।

তোমরা যারা গানের রসিক
সুরের সমঝ্‌দার,
আভাস্‌ পেয়ে সাবাস দেবে
এমনি চমৎকার।

—৺সুনির্মল বসু

চাঁদের হাসির
বাঁধ ভেঙেছে,
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধসুধা ঢালো।

—রবীন্দ্রনাথ

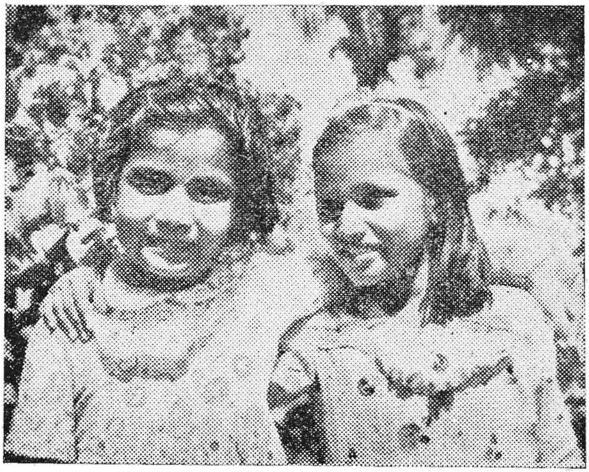

ফটো তুলেছেন ঃ—দিলীপ কীর্ত্তি, গ্রাঃ নং ১২৭৩০, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ।

মজার পাতা

নূতন ধাঁধা

১। প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাটের প্রধান শত্রু, তার নামের অক্ষর নিয়ে সুরু হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত দু'জন ব্যক্তির নামের আদি অক্ষর। কে সে? আর দু'জন ব্যক্তিই বা কে কে?

—কুমারী ইতিলতা মণ্ডল—ঝরিয়া, ধানবাদ

২। পুরো নামটি খুবই বিখ্যাত, কিন্তু নামের এক অংশ শাপভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এসে আরও বেশী বিখ্যাত হয়েছিলেন। কে?

—প্রবীর ও বুলবুল—কৃষ্ণনগর

৩। গোটা জিনিসটা গাছে থাকে, তার শেষাংশও গাছে থাকে। গোটা জিনিসটা জড়। অংশটা জীব। কী?

—সুদেব চট্টোপাধ্যায়—হাবড়া

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। মেবার রাজপুত্র চন্দ। ২। কর্ণ ও শিলাদিত্য। ৩। মেসোপটেমিয়া।

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, কস্তুরী, পম্পা, শম্পা, চৈতালী, কাঞ্চন, অনিরুদ্ধ, শিবাজী, শ্রীজ্ঞান ও কল্যাণ; অসিতকুমার, অনিলকুমার, শোভনা দাশ, চণ্ডী ও ইরা—বকুলতলা লেন, বালিগঞ্জ।

হুগলী—শান্তিরঞ্জন সিংহরায়—কোন্নগর।

২৪ পরগণা—স্মরজিৎ ও সুপ্তশ্রী মুন্সী—দক্ষিণ বারাসাত; শেখর ও সত্যকিঙ্কর সেন—বিষ্ণুপুর; রজনী, লক্ষ্মী, পাঁচু ও জয়ন্তী রায়—রাজারহাট বিষ্ণুপুর।

বর্দ্ধমান—দেবব্রত, সুব্রত, অঞ্জলি, সত্যব্রত ও প্রিয়ব্রত—আসানসোল; নিরাপদ চট্টরাজ—মিঠাপুকুর রোড; ইন্দিরা, কাঞ্চন, তুহিন ও দীপু—আসানসোল; ইন্দিরা শুভ্রা, শ্বেতা, অদিতি, অরুন্ধতি, শাশ্বতী ও মাধু—আসানসোল; সৌম্যেন্দ্র, সমীন্দ্র, বাতু, শম্ভু ও ফুলকুমারী—মাজিদা।

বীরভূম—নির্মলকুমার দাঁ—দুবরাজপুর।

মেদিনীপুর—গৌরী, দেবী ও প্রসাদ কর—চিল্কীগড়; সুশান্তকুমার—রিয়াপাড়া।

বোম্বাই—দেবপ্রসাদ, জ্যোতিপ্রসাদ, সুব্রত ও খুকু—(১০১৩৫) পারশী কলোনী।

কুচবিহার—রণজিৎ মজুমদার—সুনীতি রোড।

আসাম রাজ্য—প্রমথেশ, স্বস্তিকা, বাবু ও সোনা—(১০৮৬৯) চাঁদখিরা চা বাগান।

পঃ দিনাজপুর—রণজিৎ, অমলেন্দু, প্রণব, খোকা, কালু, চিকা, খুকু, ইন্দ্রাণী, স্বাতী, রাণী, বেলা প্রভৃতি—বীরনগর।

বিহার রাজ্য—জয়া ও খোকন—পূর্ণিয়া।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

বন্দে মাতরম্‌!

সেদিন জ্ঞানদায়িনী সর্বশুক্লা সরস্বতীর অর্চনায় শুচিশুদ্ধ তাপসকুমারের বেশে তোমাদের দেখেছি—হোমশিখার মত পবিত্র, নবারুণরশ্মির মত আনন্দোচ্ছল। দেখেছি—আর গর্বে, উল্লাসে অন্তর আমার হয়ে উঠেছে উচ্ছ্বসিত; ক্ষণে ক্ষণে মনে জেগেছে আকুল উন্মাদনা—জগৎসভার কেন্দ্রস্থলে দৃপ্তশিরে দাঁড়িয়ে মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করি—

"হের ওই নবীন ভারত,
আপনার প্রতিভায় আপনি উজ্জ্বল!
সমুদ্রপরিখা কিংবা হিমাদ্রিপ্রাকার,
দুর্নিবার অগ্রগতি কে রোধিবে তার?"

দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সেদিন আমি দেখেছি—অন্তরীক্ষপথে সদ্যোজাগ্রত ভারত-আত্মার প্রসন্ন প্রকাশ; দিব্যশ্রুতি দিয়ে সেদিন আমি শুনেছি—তারায় তারায় অতীত ভারত ঋষিগণের স্বস্তিবাচন!

তারই মাঝে মাঝে প্রমত্ত-ব্যসনীর দানবীয় হাস্যধ্বনিও কি শুনি নি?

তাও শুনেছি। চাঁদা চাইতে গিয়ে রাজপথের দরিদ্র ব্যবসায়ীর অঙ্গে আঘাত করেছে কোন অসংযত যুবক; পূজাসংগঠনীর ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে বেরিয়ে এসেছে স্বভাবদুরাত্মার ঘৃণিত স্বরূপ; লজ্জিত জাতির মনস্তাপে ধিক্কারে দেশের বায়ুমণ্ডল হয়েছে ভারাক্রান্ত।

এও শুনেছি। কিন্তু শুনেও নুয়ে পড়িনি। একজনের পদস্খলনে সংঘের বিজয়যাত্রা ব্যাহত হ'তে পারে, এ-আশঙ্কা স্থান পায়নি আমার অন্তরে। তাই সেই মুষ্টিমেয় বিভ্রান্ত তরুণকে আত্মনিরীক্ষার উপদেশ দিয়ে আজ শুধু এই কথাটিই ব'লতে চাই—"ভারতের সন্তান! ভারতের ঐতিহ্যের যোগ্য হও তোমরা। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, স্বেচ্ছাচার তোমাদের জাতীয় কৃষ্টির পরিপন্থী; পূতিগন্ধ আবর্জনার মত তাদের দূরে পরিহার ক'রে চল।"

আর, আমার দেশের অনির্বাণ আশাপ্রদীপ শিবসুন্দর কিশোর-কিশোরীগণ! তোমাদের জানাই আশীর্বাণী—'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ'—মঙ্গলের পথে বিচরণ কর; কল্যাণ কর দেশের; মুখোজ্জ্বল কর তোমার জাতির। এই শুভ ফাল্‌গুনেই আসবে ভারতজোড়া আনন্দোৎসব; "হোলি হ্যায়। হোলি হ্যায়"—উল্লাসকলরবে ধ্বনিত মুখরিত হয়ে উঠবে গ্রামে নগরে হাটবাট মন্দির গৃহাঙ্গন; তখন যেন আনন্দের প্রপাতমুখে শালীনতার বাঁধ তোমরা ভেঙে যেতে দিও না; কালিকাতাণ্ডবের চরণাঘাতে শিব যেন ভূলুণ্ঠিত না হন। সেদিকে রেখো সজাগ দৃষ্টি।

এল ফাল্‌গুন—বসন্তের জয়ধ্বজা উড়িয়ে।

"পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী,
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী"—

বাতাসে যেন ঝংকার ওঠে অদৃশ্য মুরলীর। আনন্দের দিন। স্মরণ ক'রে রাখবার মত দিন এই মধুপগুঞ্জরিত মধুমাস। এই পুণ্যমাসে তোমার দেশে উদয় হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের; এই পুণ্যমাসেই ধরণী ধন্যা হয়েছিল পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে।

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য দুই পূর্ণাবতার দুই যুগসন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তোমারই দেশে ধর্মের গ্লানি নিবারণ করবার জন্য, অধর্মের অভ্যুত্থানকে বজ্রাঘাতে বিচূর্ণ ক'রে দেবার জন্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর নদীয়ায় এসেছিল একদিক থেকে কাজীর নিষ্পেষণ, অন্যদিক থেকে তন্ত্রচারীদের নির্যাতন; আর ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-রাজধানীতে দেখা দিয়েছিল একদিক থেকে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রবল সংঘাত, অন্যদিক থেকে ইংরেজী অনাচারের সর্বতোমুখী প্লাবন। সনাতনধর্মের গ্লানির সেদিন শেষ ছিল না; বিশ্বাসী-ধর্মপ্রাণেরা সেদিন আর্ত-আকুলকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন —"এস এস দিব্যজ্যোতি, বিদূরিত কর এই অজ্ঞান তমসা; বিদলিত কর এই আসুরী অনাচার।" ধর্মক্ষেত্র ভারতের সে আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছিল ভক্তবৎসল ভগবানকে।

এই ফাল্‌গুন আমাদের অতি প্রিয়। কারণ, শুকতারার জন্মতিথি একাদশ বর্ষ-পূর্বের ফাল্‌গুনী শ্রীপঞ্চমী। তোমাদের একান্ত আপনার শুকতারা যে এগারো বছরে পদার্পণ করল—এ অবশ্য তোমাদের অজানা নয়। আমি জানি—তার এই বয়োবৃদ্ধি তোমাদের তৃপ্তি দিয়েছে; তার দৈনিক পুষ্টি ও বিস্তার লক্ষ্য ক'রে তোমরা জনে জনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছ। কারণ শুকতারার উদয় তোমাদেরই সেবার উদ্দেশ্যে; আনন্দের মুহূর্তে তোমাদের আনন্দ বাড়িয়ে দেওয়া, আর সংশয়ের ক্ষণে তোমাদের সঠিক পথটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই তার জন্ম। সে-ব্রত শুকতারা দীর্ঘ দশ বছর ধরে কায়মনোবাক্যে পালন ক'রে এসেছে; তোমাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই নববর্ষেও সে সেই ব্রতপালনের পথেই আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবে—এই তার কামনা। জয়হিন্দ্‌।

—দাদুমণি।

টেলিভিসনের সাহায্যে মাছ ধরা।

জাহাজে করে সমুদ্রে মাছ ধরা হয়। কিন্তু জলের মধ্যে মাছের ঝাঁক ঠিক কোন্ জায়গায় আছে, তা' সব সময়ে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। সম্প্রতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এমন এক প্রকার টেলিভিসন যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার সাহায্যে আকাশ থেকে মাছের ঝাঁকের অবস্থিতির স্থান নির্ধারণ করে মাছ-ধরা জাহাজগুলিকে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এই টেলিভিসন যন্ত্রের পর্দায় মাছের ঝাঁক ও জাল ফেলার ছবি দুইই বেশ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

দেবদেবীর পেটে আফিং!

সম্প্রতি কয়েকটি দেবদেবীর পেটের ভিতর আফিং পাওয়া গেছে! মানুষই আফিং খায়—সুতরাং দেবদেবীর পেটের ভিতর আফিং পাওয়াটা তোমাদের কাছে খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে! কিন্তু

চোরা-কারবারীদের কাছে অদ্ভুত বলে কিছু নেই। আব্দুল রশিদ নামে জনৈক ব্যক্তি কয়েকটি দেবদেবীর পেটে আফিং লুকিয়ে তা' চালান দিচ্ছিল—ব্যাঙ্গেলের পুলিস তা' ধরে ফেলেছে!

হায় তরুণ বাংলা!

গত সরস্বতী পুজা উপলক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় ঐ প্রতিষ্ঠানের দু'জন তরুণ আমহার্স্ট স্ট্রীটের (কলিকাতা) জনৈক তেলেভাজা-বিক্রেতার মুখে ঘুষি মেরে তাঁর দু'টি দাঁত ভেঙে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, তরুণ দু'জনকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে! বাংলাদেশের তরুণরা কোন্ পথে চলেছে?

দক্ষিণ মেরুতে মানুষ!

তোমরা নিশ্চয়ই জান পৃথিবীর একেবারে উত্তর অংশে ও দক্ষিণ অংশে মানুষের পক্ষে যাওয়া সহজ নয়। কারণ ঐ স্থানগুলি প্রায় সব সময়ে বরফে ঢাকা থাকে। দক্ষিণ মেরু আবার উত্তর মেরুর চাইতে আরও ভয়ানক স্থান। সে স্থান কেবল বরফে ঢাকা নয়—সব সময়ে সেখানে খুব জোরে তুষার ঝড় বইছে! দেহের লোমশ পরিচ্ছদ যদি একটুমাত্র খুলে যায়, তা'হলে দেহ হয়ে পড়ে সম্পূর্ণরূপে অসাড়!

এরূপ স্থানেও কিন্তু মানুষ গেছে—অবশ্য বহু চেষ্টার পর। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সর্বপ্রথম নরওয়ের অধিবাসী আমুণ্ডসেন ১৯১১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হন। আমুণ্ডসেনের এক মাস পরে ইংরেজ মেরু-অভিযাত্রী স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে সমর্থ হন।

সম্প্রতি এভারেস্ট-শৃঙ্গে আরোহণকারী হিলারী এবং তার পরে ডাঃ ফুকস্ দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেছেন।

পৃথিবীর মহাকাশে কৃত্রিম চাঁদ।

রুস বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর মহাকাশে যে দু'টি কৃত্রিম চাঁদ নিক্ষেপ করেছেন, তার কথা তোমরা জান। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রথম কৃত্রিম চাঁদটি কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এতদিন মার্কিণ বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন। কিন্তু গত ১লা ফেব্রুয়ারি (১৯৫৮) মার্কিণ বৈজ্ঞানিকরাও একটি কৃত্রিম চাঁদ পৃথিবীর মহাকাশে নিক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছেন। পৃথিবীর বহুস্থানে বেতার যন্ত্রে এই চাঁদ থেকে প্রেরিত সংগীতের ন্যায় সংকেত-ধ্বনি ধরা পড়েছে।

মার্কিণ বৈজ্ঞানিকরা এই চাঁদের নাম দিয়েছেন "১৯৫৮ আলফা"। মার্কিণ কৃত্রিম চাঁদের প্রতি ঘণ্টায় বেগ হইবে ১৯,৪০০ মাইল; এর ওজন ৩০ পাউণ্ড।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে এই চাঁদের সময় লাগে ১০৬ মিনিট।

রাশিয়ার কৃত্রিম চাঁদের তুলনায় মার্কিণ কৃত্রিম চাঁদ ক্ষুদ্র হলেও এই চাঁদ পৃথিবীর মহাকাশে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন টিকে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

টেলি : বিদ্যাসেবা — পোঃ বক্স : ১১৪৫০

জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও উন্নতির মূলভিত্তি

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস্ লিঃ

হেড অফিস :—৩২এ, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা—১

ফোন :—২২-১৫৩২, ২২-১৫৩৩, ২২-১৫৩৪ (তিন লাইন)

সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি ইত্যাদি
ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করেন

ব্রাঞ্চ :—১৬৭ নং, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৪।৩৫ " " " "
৬৪ নং, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা — ফোন নং : ৩৪-১০২০

মফস্বল ব্রাঞ্চ :—এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচি ও কটক

Reg. No. C. 3063 "Suktara"

পূজা বার্ষিকী
নব পত্রিকা
মূল্য ৪.
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা-৯

শিবরামের
হাসির গল্প
যত হাসি ততই মজা
মূল্য ২.
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা-৯

ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানা
দাম
তিন টাকা

ঠাকুর-মার ঝুলি
দাম ৩, টাকা

আলো দিয়ে গেল যারা
দাম ২, টাকা

পূজোর উপহার
অনেক দিনের অনেক কথা
দাম ২,টাকা
• দেব সাহিত্য কুটীর • কলিকাতা-৯ •

রাধারাণী দেবীর
গল্পের আলপনা
দাম ২,টাকা
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা-৯

চিত্রে জয়দেব
[গীতগোবিন্দ]
অনুবাদ করেছেন—
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
অসংখ্য ছবি···দু-রংএ ছাপা—৬,

বিশ্ব-পরিচয়
[পৃথিবীর ইতিহাস]
অসংখ্য চিত্র-সংবলিত প্রায়
৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস—৮,

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত
পুরানো দিনের ও পুরানো গল্প

পূজার উপহার.......
আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ গল্প—
শোনো শোনো গল্প শোনো
দাম ২,টাকা
দেব সাহিত্য কুটীর • কলিকাতা-৯

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প
২,

সুষমা সেন প্রণীত
রন্ধন-শিক্ষা
সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বই···দাম—৩, টাকা

গল্পের মায়া-পুরী
২,